দাম : যোলো টাকা

# স্বস্তিকা

দেশের উন্নয়নের পথে বাধা মাওবাদ অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট একটি সঠিক পদক্ষেপ — পৃঃ ২৩

চিন্ময় প্রভুর মুক্তিতে জেহাদিদের কাছে আত্মসমর্পণ বাংলাদেশ আদালতের— পৃঃ ১৩

৭৭ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ৯ জুন, ২০২৫।। ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

# মাওবাদ

## দেশের নিরাপত্তার বড়ো চ্যালেঞ্জ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৯ জুন - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ◻ ৫

**‘কাঁচায় না নুইলে বাঁশ’ : রাজনৈতিক গোড়াপত্তন থেকেই নিম্নরুচির নেতা চেনা যায় : পাপোশ পুলিশ** ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

**দিদিকে ক্ষমা করবেন যশোদাবেন** ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

**নাগরিকত্বের আড়ালে নাশকতা : চাই নাগরিকত্ব আইন সংশোধন** ◻ জয়া ভারতী ◻ ৮

**শুধু মাওবাদীমুক্ত নয়, প্রয়োজন মাওবাদমুক্ত ভারত** ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

**জেহাদি আক্রমণের কবলে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ** ◻ ড. বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ১১

**চিন্ময় প্রভুর মুক্তিতে জেহাদিদের কাছে আত্মসমর্পণ বাংলাদেশ আদালতের** ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১৩

**ওয়াকফ নিয়ে এত অশান্তি নেপথ্যে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজনীতি** ◻ কাজি মাসুম আখতার ◻ ১৫

**সন্ত্রাসমুক্ত অরণ্য : অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট ও লাল সন্ত্রাসের শেষ অধ্যায়** ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১৭

**দেশের উন্নয়নের পথে বাধা মাওবাদ : অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট একটি সঠিক পদক্ষেপ** ◻ অরিন্দম ভট্টাচার্য ◻ ২৩

**পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব** ◻ সপ্তর্ষি ঘোষ ◻ ৩১

**হিন্দু দর্শন বেদভিত্তিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি** ◻ বন্দনা বিশ্বাস ◻ ৩২

**ধর্মরাজ্য সংস্থাপক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ** ◻ প্রবীর কুমার মিত্র ◻ ৩৩

**সমগ্র ভারতবাসীর নিকট প্রণম্য লোকমাতা অহল্যাবাঈ** ◻ সুতপা বসাক ভড় ◻ ৩৪

**ইমাম-মোল্লা-মৌলবিরা ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে** ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৩৫

**অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে বালোচদের নৃত্যের মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ** ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৭

**বাসব অতি সুবোধ বালক : মাকু-পাকু-সেকু-নেকুদের চোখে জল** ◻ পিনাকপাণি ঘোষ ◻ ৪৩

**পশ্চিমবঙ্গের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন** ◻ সৌরভ সিংহ ◻ ৪৫

**ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা** ◻ অভিজিৎ ভট্টাচার্য ◻ ৪৭

**মাওবাদ না মানবতাবাদ, আপনারা কার পক্ষে কমরেড?** ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

**গল্পকথায় ডাক্তারজী** ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

**নিয়মিত বিভাগ :**

**◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৮ ◻ খেলা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে
১৬ জুন
২০২৫

# স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৬ জুন
২০২৫

## চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি আজ ভারত

অগ্রগতির পথে ভারতের অর্থনীতি। নীতি আয়োগের সিইও জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জাপানের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিচালনায় ভারত এই মাইলফলক অতিক্রম করেছে— এটি প্রতিটি ভারতবাসীর গর্বের বিষয়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন অর্থনীতির ছাত্র-গবেষক।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market**

**Kolkata-700 006**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## উন্নয়নের স্বার্থেই মাওবাদীমুক্ত ভারত

হাজার বৎসরের পরাধীনতা সমাপ্ত হইয়াছিল ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া। খণ্ডিত ভারতেরই অংশ পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। জন্মাবধি তাহারা ভারতের বুকে আঘাত করিয়া দেশের মাটিকে রক্তরঞ্জিত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের কার্য তাহাতে ব্যাহত হইয়াছে। নবগঠিত দুর্বল ভারত সরকার সেই সন্ত্রাস দমনে কার্যকরী পদক্ষেপও গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই কারণে দেশের অগ্রগতিও আশানুরূপ হইতে পারে নাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই বিদেশি মতাদর্শপুষ্ট কমিউনিস্টরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে নানাপ্রকারে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। স্বাধীনতার পরেও তাহাদের সেই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। দেশের উন্নয়ন কার্যে সর্বপ্রকার বিরোধিতাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই তাহাদের কয়েকজন নেতা উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার নাম করিয়া এক ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিল। চীনের মাও-সে-তুং এবং রাশিয়ার লেনিন ইহাদের আদর্শপুরুষ। 'জনযুদ্ধ'-এর মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রের উৎখাত সাধনই ইহাদের লক্ষ্য। ইহারা নিজেদের মাওবাদী বলিলেও নকশালবাড়ি হইতে তথাকথিত 'যুদ্ধ' শুরু করিয়াছিল বলিয়া জনমানসে তাহারা 'নকশাল' নামেই অধিক পরিচিত। ১৯৬০-এর দশকে ইহারা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শ্রেণীশত্রু খতমের নামে ইহারা শিক্ষক-অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বড়ো কৃষক, পুলিশ, দারোগা সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদরদি উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেনকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই ইহারা ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে। দেশবরেণ্য মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ইহারা চূর্ণ করিয়াছে। সমাজ পরিবর্তনের নাম করিয়া শত শত বিপুল সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীকে বিপথে চালিত করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর সৌভাগ্য যে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের তৎপরতায় এক দশকের মধ্যেই এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন স্তব্ধ করা হইলেও ততদিনে ইহারা ওড়িশা, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের ন্যায় জনজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে জাল বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের উৎসাহিত করিয়াছে শহরের ভারতবিরোধী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন শিক্ষক-অধ্যাপক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকরাও। ইহারাই আরবান নকশাল নামে পরিচিত। ইহা ব্যতীত দেশ বিদেশের কমিউনিস্টরা তো রহিয়াছেই। ভারতের তৎকালীন দুর্বল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া দেশের ৪০ শতাংশ এলাকায় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া ৯২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ব্যাপী রেড করিডোর নির্মাণ করিয়া তাহাতে ইহারা সমান্তরাল এক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল। জনজাতিদের অধিকার রক্ষার নাম করিয়া তাহাদের দেশের উন্নয়ন যজ্ঞের বাহিরে থাকিতে বাধ্য করিয়াছিল। যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে মাওবাদীরা তাহাদের হত্যা করিয়াছে। স্থানীয় মানুষের নিকট হইতে অবৈধ কর আদায় করিয়াছে। মহিলাদের যৌন শোষণ করিয়াছে। নির্বিচারে দেশের নিরাপত্তা কর্মীদের হত্যা করিয়াছে। গভীর অরণ্যে দরিদ্র জনজাতিদের দ্বারা আফিং, গাঁজা চাষ করাইয়া কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছে। তাহাদের স্বরূপ অনুধাবন করিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ ইহাদের দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বৃহত্তম হুমকি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ হইতে মাওবাদী উৎখাতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়া একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশ মাওবাদী মুক্ত করিবার সময়সীমা নির্ধারণ করিয়াছে। তাহারই লক্ষ্যে বিভিন্ন অভিযানে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী সফলও হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা-সহ বেশ কয়েকজনকে নিহত করিয়া নিরাপত্তা বাহিনী বহু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করিয়া তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়াছে, ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলা মাওবাদী মুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। ভারতের উন্নয়ন যজ্ঞে দেশের দরিদ্রতম মানুষটিকেও উন্নয়নের অংশীদার করিবার লক্ষ্যেই ভারত সরকারের এই সকল পদক্ষেপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এহেন যুগান্তকারী সফলতায় শহুরে মাওবাদীরা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নানাভাবে সরকারের সমালোচনায় মুখর হইয়াছে। তাই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই শহুরে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে দেশের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন কি সম্ভব হইবে ?

### সুভাষিতম্

**সর্বতীর্থময়ী মাতা সর্বদেবময়ঃ পিতা।**
**মাতরং পিতরং তস্মাৎ সর্বযত্নেন পূজয়েৎ।।**

মা সর্বতীর্থ স্বরূপা এবং বাবা সর্বদেবতা স্বরূপ। সেজন্য সর্বপ্রকারে মা-বাবার পূজা করা উচিত।

## ‘কাঁচায় না নুইলে বাঁশ’ : রাজনৈতিক গোড়াপত্তন থেকেই নিম্নরুচির নেতা চেনা যায়

# পাপোশ পুলিশ

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

‘জন্ম যেমন যার। কর্ম তেমন তার।’ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছবিতে কবির লড়াইয়ে এই গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। বোলপুর বাজারে পুলিশের দালালি করা নেতা যে পুলিশকেই অশ্রাব্য গালাগাল করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। মুর্শিদাবাদে হিন্দু হত্যার ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, রাজ্যের শাসক পুলিশকে পাপোশ বানিয়ে রেখেছে। রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশকর্তা জামিনে রয়েছেন। একসময় সিবিআই-এর তাড়া খেয়ে চোরের মতো পালিয়ে বেড়াতেন। বিদেশি বাম জমানায় তাঁকে ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়। তিনি শিক্ষা ব্যবহার করে তিনি সারদা চিটফান্ডের বেআইনি তথ্য হাপিশ করে দেন। আর তাতে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে যাত্রায় বেঁচে যান।

‘ভাষা সন্ত্রাস’ এই রাজ্যে নতুন নয়। যুব কংগ্রেসি জমানায় তার জন্ম। বিদেশি বামপন্থীদের কোলে মানুষ। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্কুলে তার বিকাশ ঘটে। রাজ্যে কোনোদিন বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠা হলে এই কুরুচি ও অসভ্যতা অবশ্যই মুছবে। ১৯৬৬-র পর থেকে এই রাজ্যে বিদেশি বামেদের অসভ্য হুল্লোড় শুরু হয়। ভারতের ন’টি রাজ্যে অ-কংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় আসে। এ রাজ্যের সভ্য রাজনীতির আঙিনায় জন্ম নেয় মানুষকে ঘেরাও আর ভাষা সন্ত্রাসের নোংরামি। রাজনীতিবিদ অতুল্য ঘোষকে ‘কানা অতুল্য’ এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ‘কাঁচকলা মন্ত্রী’ বলে ডাকা শুরু হয়। তবে ২০০৬-০৭ সালে বামনেতা বিনয় কোঙার সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন ঘিরে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করে সব বাঁধ ভেঙে দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নোংরা কটূক্তি করেন সিপিএম নেতা অনিল বসু। লজ্জায় পড়ে বিদেশি দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। বামনেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত--- পুলিশের বন্দুকের গুলিতে ‘জন্মনিরোধক’ পরানো আছে কিনা তাই নিয়ে একসময় মন্তব্য করেন। ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাবকে পুলিশের পিঠের ছাল তুলতে চেয়েছিলেন। অনুব্রত মণ্ডল তাকেই একটু খারাপভাবে অনুসরণ করেছেন।

রাজনীতি থেকে রাজধর্ম অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। একসময় ভদ্রলোক আর কমিউনিস্টদের আলাদা করে দেওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ রাজ্যের চরম সর্বনাশ করে যাওয়া এক পশ্চাৎপদ বাম মন্ত্রী নিজেকে ভদ্রলোক নয়, কমিউনিস্ট বলে দাবি করেছিলেন। ‘ছদ্ম বুদ্ধিজীবী’ ওই নেতা এবং অন্য এক সুবিধাবাদী চীনপন্থী নাট্যকার মিলে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি মঞ্চে নোংরামি ও ভাষা সন্ত্রাস ঢুকিয়েছে। ঘৃণ্য নাট্যকারটি চীনকে তার বাবা আর মা বলত। পরে অস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তারি এড়াতে পুলিশের কাছে মুচলেখা দেয়। যুব কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার তাঁর মিরর স্ট্রিটের বাড়িতে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ‘যেদিন রাস্তার গুন্ডা, মস্তান আর সমাজবিরোধীদের পাশে বসিয়ে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করি, সেদিন থেকেই রাজনীতি সমাজবিরোধীদের দখলে চলে যায়। যাদের পুলিশের গুলি খেয়ে মরার কথা, তারা সকলে চা পান করে আমাদের বাড়ির সদস্য হয়ে যায়।’

> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে তাই নখ-দাঁত বের করে ফেলেছেন। তাতে যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ‘অপারেশন সিঁদুর’কে পক্ষান্তরে খাটো করার চেষ্টা তিনি করেছেন তা বোঝেননি।**

কথায় বলে ‘কাঁচায় না নুইলে বাঁশ। পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ’। ছোটোবেলায় সঠিক শিক্ষা না পেলে বড়ো হয়ে সে অশিক্ষিত হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে যুব কংগ্রেস নেতাদের ঘরে মানুষ হন, তাদের সেই কুশিক্ষাই ছিল। টেবিলে ছুরি গেঁথে পরীক্ষায় পাশ করা ছিল তাদের রীতি বা পদ্ধতি। তাদেরই একজন মাথায় পক্ষাঘাতে জীবনের শেষ ক’টা বছর বোবা হয়ে মারা যান। অন্যজন পায়ে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে ঠাঁই পান। শাসক হয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুব কংগ্রেসের কুরুচিকর সংস্কৃতি ভুলতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে তাই নখ-দাঁত বের করে ফেলেছেন। তাতে যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ‘অপারেশন সিঁদুর’কে পক্ষান্তরে খাটো করার চেষ্টা তিনি করেছেন তা বোঝেননি। অথচ এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক কালে বামেদের বহুরকমের ব্যক্তিগত ভাষা সন্ত্রাসের শিকার ছিলেন। কুরুচিকর রাজনৈতিক কৌশল যে ব্যবহার করতে নেই সেটা হয়তো কেউ তাঁকে শেখাননি।

প্রণব মুখোপাধ্যায় মনে করতেন জনআন্দোলন করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ প্রয়োজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনতার ভাষা বোঝেন। সক্রিয় ও দলীয় রাজনীতিক হিসেবে প্রণববাবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুচির অধঃপতন ও নিম্নমুখিতা দেখে যেতে পারেননি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ‘দাদা’ বলে সম্বোধন করতেন। পশ্চিমবঙ্গের একটা বড়ো অংশের শিক্ষিত ও মেধাসম্পন্ন মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘কৌতুকচরিত্র’ হিসেবে দেখেন। তার ‘মিম’ উপভোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে কোনো গুরুত্ব দেন না। ভোট দিতেও যান না। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লজ্জার। তাই বলি ‘কাঁচায় না নুইলে বাঁশ। পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ (ঠাস ঠাস)।’

*(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

# দিদিকে ক্ষমা করবেন যশোদাবেন

সিঁদুরবিদ্বেষীষু দিদি,

ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর পছন্দ হয়নি পাকিস্তানের। ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর পছন্দ হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আচ্ছা দিদি, সোজা কথাটা সোজা করে বলে দিলাম বলে নিশ্চয়ই আপনি রাগ করবেন না। রেগে গেলেও ক্ষমা করে দেবেন। কারণ, আমিও আপনার হয়ে শ্রীমতী যশোদাবেন মোদীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

দেখুন, আমি এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্ত্রী হিসেবে পরিচয়টা দিতেই পারতাম। কিন্তু দিইনি। কারণ, এই পরিচয়টা যশোদাবেন অন্তরে বহন করলেও ব্যবহার করেন না। কলকাতা বিমানবন্দরে একবার আপনার সঙ্গে দেখা হলে ওঁকে আপনি তৎক্ষণাৎ শাড়ি কিনে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে জানতেই পারেননি আপনার রাজ্যে, আপনার শহরে পূজা দিতে এসেছেন। আসলে স্বামীর পরিচয় তিনি ভাঙান না। কেন জানেন? তিনি একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। যা ইদানীংকালে বেশ দুর্লভ।

যশোদাবেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। পিত্রালয়ে থাকেন। না, স্বামী বিশ্বখ্যাত নরেন্দ্র মোদীর স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে বা এই পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল পরিবারের সদস্যদের মতো সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাননি। কখনো যশোদাবেন স্বামীর পরিচয় খাটিয়ে কিছু করেছেন বা করতে চেয়েছেন বলে শোনা যায়নি। ধর্মপত্নী হিসেবে স্বামীর মঙ্গলকামনায় পূজা দিতে কলকাততেও এসেছিলেন চুপচাপ। তখনই আপনার সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা হয়। যশোদাবেনের ঠাঁটবাটও নেই। বিজেপিকে হয়তো ভোট দেন, তবে দলের কেউ নন। তাঁকে সিঁদুর পরানোর জন্য আপনি কেন যে এত দরদ দেখালেন কে জানে? যশোদাবেন নিশ্চয়ই গোপনে আপনার কাছে কান্নাকাটি করেননি। খেয়াল করবেন গুজরাটের রীতি মেনে ওঁর গলায় সব সময়েই মঙ্গলসূত্র দেখা যায়।

এটা সকলের জানা যে, মোদী বহুকাল আগে সংসার ত্যাগ করে দেশের কাজের জন্য ঘরছাড়া হন। যশোদাবেন নিজের বাবার বাড়ি ফিরে আসেন। সাধারণ দাম্পত্য বলতে যা বোঝায় সেই সম্পর্ক তাঁদের ছিল না। যশোদাবেন মোদীর বাবা-মায়ের মতোই বুঝেছিলেন সংসারে বেঁধে রাখার জন্য নরেন্দ্রর জন্ম হয়নি। যশোদাবেন কোনোদিন নিজের স্বামীর নামে নিন্দা বা কোনো অভিযোগ করেননি। বৈবাহিক জীবন নিয়ে কোনো কথা বলেননি। যাবতীয় যশ থেকে দূরত্ব রেখেছেন যশোদাবেন।

জানেন দিদি, আমি এটা বিশ্বাস করি যে, নরেন্দ্র মোদী আজকে যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন সেটা সম্ভব হতো না যদি যশোদাবেনের মতো ধর্মপত্নী না পেতেন। চাহিদাহীন স্ত্রী। আজীবন দূরে থেকে স্বামীর বৃহত্তম সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়েছেন। তিনি এতটাই ব্যক্তিত্বময়ী যে তাঁর কখনোও মোদীর সাহায্যের দরকারও হয়নি। আমি মনে করি, নরেন্দ্র মোদী হয়ে উঠতে গেলে সবার জীবনে যশোদাবেনের মতো একজন একনিষ্ঠ অথচ নির্লোভ-নীরব জীবনসঙ্গী প্রয়োজন।

আসলে মোদীর পরিবারের বাকিদেরও তো দেখেছেন যশোদাবেন। তিন বারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে টানা চারবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সেই গুজরাটেই মোদীর পরিবার থাকে। কিন্তু তাঁরা কে, কোথায় কেউ জানে না। আর ঠিক উলটোটা কলকাতায়। দিদি মুখ্যমন্ত্রী হতেই পরিবারের সবাই আলোয় আলোকিত। দিদি, আপনার এক ভাইপোকে সবাই চেনেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পিসি মুখ্যমন্ত্রী হতে না হতেই ব্যবসায়ী ভাইপো রাজনীতিতে। তার জন্য নতুন সংগঠন তৃণমূল যুবা তৈরি হয়। নিশ্চিত আসন ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রবীণ সাংসদ সোমেন মিত্রকে সরিয়ে প্রার্থী। তার পরে দলটা রাজ্যের হলেও ভাইপো দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বাকি ভাইপো, ভাইঝিদের মধ্যে একজন চিকিৎসক। আর বাকিরা পিসি ও বড়দা অভিষেকের সঙ্গে রাজনীতিতেই রয়েছেন।

ভাইপোর মা ও বাবা কুখ্যাত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডিরেক্টর। দলের বা সরকারের কোনো পদে না থাকলেও লন্ডন সফরে মমতার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন অভিষেক জননী লতা। আবার বাবা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের রঙের দোকান থেকে তো রাজ্যের সব নীল-সাদা রং কেনা হয়। সরাসরি দলের পদ না দিয়েও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আরও দুই ভাইকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন আপনি। একজন কার্তিক, অন্যজন গণেশ। এই কার্তিক-গণেশ জুটির হাতেই আপনি তুলে দেন দলের ‘জয় হিন্দ’ বাহিনীর ভার। বছরে একদিন ২৩ জানুয়ারি যে সংগঠনের নাম শোনা যায়। কার্তিকের ভালো নাম সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। সমাজসেবী কাজরীর আবার নাকি প্রায় চারকোটি টাকার সম্পত্তি। আপনার ‘ছোটোভাই’ হলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাবুন। যাঁর সঙ্গে মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন আপনি, লোকসভা নির্বাচন হাওড়া সদর আসনে প্রার্থী হতে চেয়ে বাবুন আপনার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। রাগের চোটে ত্যাজ্য ভাই করে দেওয়ার পরেও আবার আদর করে ভাইফোঁটাও অবশ্য দিয়েছেন। আপনার মুখে দিদি মোদী পরিবারের কাউকে নিয়ে কথা বলা মানায় না। সেই পরিবারের একজনও রাজনীতির ছায়া মাড়ান না। সকলেই সাধারণ জীবনযাপন করেন।

□

অতিথি কলম

জয়া ভারতী

# নাগরিকত্বের আড়ালে নাশকতা

# চাই নাগরিকত্ব আইন সংশোধন

পহেলগাঁও জঙ্গি হানায় ২৬ জন নির্দোষ হিন্দুকে শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নির্মম হত্যা সারা দেশকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনার পর আরও একটা বড়ো সমস্যা ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসে যা শুধুমাত্র হিংস্র কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা বিপুল সংখ্যায় অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিষয়ে উদ্ভূত নানা সমস্যার দিকে ইশারা করছে।

ভারত সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য পাকিস্তানি নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর কথা বলতেই বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে। এই সিদ্ধান্তের পর যে দৃশ্য সামনে এসেছে, তা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। বড়ো সংখ্যায় ভারতীয় মুসলমান মহিলা তাদের পাকিস্তানি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু তারা ফিরতে পারে না, কারণ তাদের কাছে রয়েছে ভারতীয় পাসপোর্ট, কিংবা তাদের সন্তান ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে, আর তারা ভারতীয় নাগরিক।

যখন সারা দেশ নিহত নাগরিকদের জন্য শোক পালন করছে, তখন কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা মোমবাতি মিছিল এবং একতার প্রতীকাত্মক প্রদর্শন করা হচ্ছিল। কিন্তু এসবের পিছনে থাকা আরও একটি উদ্বেগজনক সত্য প্রকাশ্যে আসে। বড়ো সংখ্যায় ভারতীয় মুসলমান মহিলার বিয়ে পাকিস্তানি পুরুষের সঙ্গে হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তানি মহিলা ভারতীয় মুসলমান পুরুষদের বিয়ে করে ভারতেই বসবাস করছে। এইসব পরিবার শুধু যে ভারতে থাকছে তা নয়, বরং বংশবিস্তার করে ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত অধিকার ভোগ করে চলেছে।

**ভারতের মাটিতে শত্রুদেশের সন্তান**

সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, এমন প্রতিটি দম্পতি ৮-১৫ টা পর্যন্ত শিশুর জন্ম দিয়েছে। এরা সকলেই ভারতে জন্মানোর কারণে আইনিভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পাকিস্তানি মা হোক কিংবা বাবা, তাদের সন্তান কিন্তু ভারতীয়। অপরদিকে এই মা অথবা বাবা সেই দেশের নাগরিক যারা ভারতের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসী যুদ্ধ করে চলেছে, গাজওয়া-এ-হিন্দের ভাবধারায় চলছে। কিছু পাকিস্তানি পুরুষ ভারতের মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করে 'পিআর' (পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি) নিয়ে এখানেই বসবাস করছে। এখানে বংশবিস্তার করছে, এদেশে জন্ম হওয়া তাদের সন্তানদের নামে সম্পত্তি কিনছে এবং সর্বোপরি ভারতীয় আইনের ফাঁকফোকড়ের যথেচ্ছ সুবিধা তুলছে। এটা শুধু বিয়ে নয়, বরং সুপরিকল্পিতভাবে ভাবধারা, কট্টরপন্থা ও জনসংখ্যার অনুপ্রবেশ। এটা কোনো ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনি নয়। এটা একটা প্রক্রিয়া যা ভারতের জনসংখ্যাগত পরিকাঠামো এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাকে বিনা অস্ত্রে পরিবর্তনের এক নিঃশব্দ প্রয়াস।

**আইনগত ত্রুটির কারণে ঘটছে অনুপ্রবেশ**

- পাকিস্তানি পুরুষ যারা পাকিস্তানে থাকছে অথবা ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে ভিসা নিয়ে রয়েছে, তারা ভারতীয় মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করে আর তারপর নকল কাগজপত্র বা ঢিলাঢালা সরকারি নীতির কারণে এদেশেই বসবাস করতে থাকে।
- অনেক ভারতীয় মুসলমান মহিলা ভারতীয় পরিচয়েই থেকে যায়, যদিও তার বিয়ে পাকিস্তানি পুরুষের সঙ্গে হয়েছে।
- তাদের সন্তানের জন্ম ভারতে হওয়ার কারণে ভারতের নাগরিকত্ব জুটে যায়। ফলস্বরূপ এমন পরিবার পুরোপুরি ভারতেই স্থায়ী হয়ে যায় এবং পরবর্তী প্রজন্ম ভোট দেওয়া থেকে শুরু করে সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে--- যদিও তাদের যোগাযোগ শত্রুদেশের সঙ্গেই থাকে।

**নিকা নাকি ভারতের সুরক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা?**

এই শিশুদের আনুগত্য কোথায় থাকবে? যার বাবা শত্রু দেশের, তারা কি ভারতীয় মূল্যবোধে লালিত পালিত হবে নাকি পাকিস্তানের চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হবে? যখন এসব শিশু বড়ো হয়ে ভোট দেবে, সরকারি সুযোগ সুবিধা নেবে বা প্রচার-প্রসারের কাজে যুক্ত হবে--- তখন কি তা ভারতের জন্য ক্ষতিকারক পরিস্থিতি উৎপন্ন করবে না?

**শত্রু সম্পত্তি আইনের সীমাবদ্ধতা**

ভারতের 'শত্রু সম্পত্তি আইন, ১৯৬৮' এই উদ্দেশ্যে নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে পাকিস্তানের মতো শত্রুদেশের নাগরিক ভারতে কোনো সম্পত্তির অধিকারী হতে না পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আইন যথোপযুক্ত নয় বলে প্রমাণিত। এই আইন শুধুমাত্র শত্রু দেশের নাগরিককে সম্পত্তি রাখার অধিকার থেকে আটকায়, কিন্তু সেসব শিশুর ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব পড়ে না যারা শত্রু দেশের নাগরিক এবং ভারতীয় নাগরিকের বিয়ের পর ভারতে জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ আইনি দিক থেকেই আমরা পেছনের দরজাটা খুলেই রেখেছি, যাতে শত্রুদেশ ভারতের জনসংখ্যা ও মূলধারার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

> "বর্তমানে যুদ্ধ শুধু বন্দুক দিয়ে নয়, বরং সূচনা, প্রযুক্তি, মতাদর্শগত যুদ্ধ এবং বিভিন্ন সম্পদের জন্যও ছদ্ম যুদ্ধ চলছে। ভারতকে এখন জাগতে হবে। প্রতিটা ফাটল বন্ধ করতে হবে, যাতে শত্রুদেশ আমাদের দেশের জনসংখ্যা, মতাদর্শ ও গণতন্ত্রের দেওয়ালে সিঁধ কাটতে না পারে।"

**ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর প্রশ্ন**

যখন ভারতীয় মহিলা পাকিস্তানি পুরুষকে বিয়ে করে ভারতে ৮-১০টি বা তার চেয়েও বেশি শিশুর জন্ম দেয়, তখন বিষয়টা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়ে থেমে থাকে না, বরং তা গুরুতর জাতীয় সংকট হিসেবে উঠে আসে।

**(১) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব :** এসব শিশুর মানসিকতা, শিক্ষা ও ভাবনাচিন্তা পাকিস্তানের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বড়ো হয়ে তারা ডিজিটাল জেহাদ, আদর্শগত ও রাজনৈতিক ক্ষতিসাধন এবং মতাদর্শগত যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।

**(২) ভোটব্যাংকের রাজনীতি :** এমন নাগরিক ভারতে ভোট দিয়ে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সীমান্তবর্তী এলাকা ও সংবেদনশীল রাজ্যের ক্ষেত্রে এই অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে।

**(৩) আর্থিক শোষণ :** এই পরিবারগুলি ভারতে নিঃশুল্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেশন, আবাস যোজনার সুবিধা পেয়ে থাকে। শত্রুদেশের নাগরিকের সন্তানদের ভরনপোষণ ভারত সরকারের যোজনার মাধ্যমে এবং ভারতবাসীর করের টাকায় হয়ে চলেছে। এটা যে শুধু আর্থিক দৃষ্টিতে অন্যায় তা নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ব্যাপারে প্রকাশ্য উপহাস। তাই একে ভারতবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বললেও হয় অতিশয়োক্তি হবে না।

**এখন প্রয়োজন কঠোর আইনি পরিবর্তনের**

**(১) নাগরিকত্ব আইনে সংশোধন :** যদি মা-বাবার মধ্যে একজনও শত্রুদেশের নাগরিক (পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা চীন) হয়ে থাকে, তবে এমন শিশুকে ভারতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত নয়।

**(২) বিয়ে এবং সন্তানের সমীক্ষা :** সরকারকে একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করে সমস্ত ভারত-পাক নাগরিকের বিয়ে এবং তাদের সন্তানদের আইনি মূল্যায়ন করা উচিত। এরকম বিয়ের অনুমতি ভারতের নাগরিকত্ব ছাড়ার শর্তেই দেওয়া উচিত।

**(৩) রিলেশন ভিসার উপর নিষেধাজ্ঞা :** পাকিস্তানের মতো শত্রুদেশ থেকে পাওয়া সমস্ত 'রিলেশন ভিসা'-র উপর শীঘ্রই নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত এবং আগে থেকেই রয়েছে এমন লোকেদের উপর তদন্ত করা উচিত। যা জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

**'বৈবাহিক আনুগত্য'-এর শর্ত লাগু করা উচিত**

যদি কোনো ভারতীয় নাগরিক শত্রুদেশের নাগরিককে বিয়ে করে, তাহলে তার নাগরিকত্ব সত্বর সমাপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এটা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং ভারতের সার্বভৌমত্বের জন্য অত্যাবশ্যক।

এমন ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত বিষয় থেকেও বঞ্চিত করা উচিত :

● যে কোনো চাকরি বা পদ ● কোনো নির্বাচনে দাঁড়ানো ● কোনো সরকারি সুবিধা, ছাড় ও সংরক্ষণ।

**তৃতীয় দেশের নাগরিক হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ : একটা নতুন চাল**

যদি কোনো ব্যক্তি শত্রুদেশের নাগরিক হন, তিনি তৃতীয় কোনো দেশ যেমন ইউকে, কানাডা ইত্যাদি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকলেও তার সঙ্গে বিয়ের কারণে ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হওয়া উচিত।

পাকিস্তানি নাগরিক প্রথমে কোনো পশ্চিমি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এবং তারপরে ভারতে বিয়ের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাস ও নাগরিকত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। এটা একটা ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং সুপরিকল্পিত রণকৌশল। এটা শুধুমাত্র পাসপোর্ট বা দেশ বদলের প্রক্রিয়া নয়, বরং চিন্তাধারা, নিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়। এমন ব্যক্তির ভারতে উপস্থিতি, সে যেকোনো দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা এবং সামাজিক সমরসতার ক্ষেত্রে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে।

**এটি বিদ্বেষ নয়, আত্মরক্ষা**

কিছু লোক একে মানবাধিকারের বিষয় বলে এর বিরোধিতা করতে পারেন। যখন কংগ্রেস নেতৃত্বকে ভারতের বিপক্ষে অনবরত পাকিস্তানের সমর্থনে দাঁড়াতে দেখা যায়, তখন এটা স্বাভাবিক যে দেশহিতে ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যে কোনো আইনেরই তারা বিরোধিতা করবে। এর পাশাপাশি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা শ্রেণী যারা প্যালেস্তাইনের সমর্থনে মিছিল করে, কিন্তু কখনও কাশ্মীর বা বাংলাদেশের হিন্দু নরসংহারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে না, যারা পাকিস্তানের পতাকা মাটি থেকে তুলে মাথায় ঠেকায়,তাদের কাছ থেকেও দেশের জন্য কাঠোর ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিরোধিতারই আশা করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, এটা কোনো ধর্মীয় বা মতাদর্শ সম্বন্ধীয় বিষয় নয়, বরং আত্মরক্ষার অধিকার।

যখন শত্রুদেশ বৈবাহিক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতের জনসংখ্যাগত পরিকাঠামো এবং সুরক্ষাবলয় নষ্ট করার রণনীতি গ্রহণ করা হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে আইন দ্বারা স্পষ্ট ও কঠোর প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। শত্রুদেশের নাগরিক এখানে এসে বিয়ে করে নিজেদের শিকড় বিস্তার করে চলেছে— বিষয়টা আমাদের জন্য মানবতা নয়, মূর্খতা। প্রত্যেক সার্বভৌম দেশের নিজের সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যাগত ও সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকার অধিকার রয়েছে।

যদি এই মতাদর্শগত ও জনসংখ্যাগত অনুপ্রবেশের উপর দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যায়, তবে ভারতের অন্যান্য অংশও পশ্চিমবঙ্গের মতো সংকটজনক এলাকায় পরিণত হবে। যেখানে মূল নিবাসী বিশেষ করে হিন্দুরা জেহাদিদের কারণে নিজভূমিতে অসুরক্ষিত ও উদ্বাস্তু হওয়ার পথে। এটা কোনো বিয়ের বিষয় নয়, বরং পাকিস্তান সমর্থক চিন্তাভাবনা, কট্টরবাদী ভাবনার বিস্তারের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। ভারতে জন্ম হওয়া বাচ্চাদের নাগরিকত্ব প্রদানের আইনি ফাঁকের অপব্যবহার করে এমন একটা জনবিন্যাস তৈরি করা হচ্ছে যাদের আস্থা ভারতের প্রতি না হয়ে শত্রুদেশ এবং তার চিন্তাধারার প্রতি থাকছে। ঠিক এই ধরনের অবস্থা ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেনের মতো দেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে মূল নাগরিকরা এখন শরিয়া সমর্থকদের চিৎকার, আইন বিরোধী গোষ্ঠী এবং ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের থেকে আতঙ্কিত।

ভারতকে এই বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য বর্তমানে শুধুমাত্র একজনের নেতৃত্বের উপরই দেশের ভরসা— তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সাহসী, রাষ্ট্রবাদী ও নির্ণায়ক নেতৃত্বই এই সমূহ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে। দেশবাসী এখন অধীর আগ্রহে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি নাগরিকত্ব আইনে উপযুক্ত সংশোধন করে ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচিতি, সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।

বর্তমানে যুদ্ধ শুধু বন্দুক দিয়ে নয়, বরং সূচনা, প্রযুক্তি, মতাদর্শগত যুদ্ধ এবং বিভিন্ন সম্পদের জন্যও ছদ্ম যুদ্ধ চলছে। ভারতকে এখন জাগতে হবে। প্রতিটা ফাটল বন্ধ করতে হবে, যাতে শত্রুদেশ আমাদের দেশের জনসংখ্যা, মতাদর্শ ও গণতন্ত্রের দেওয়ালে সিঁধ কাটতে না পারে। দেশের সুরক্ষার বিষয়ে কোনো রকম আপোশ করা হবে না।

*(লেখিকা প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক)*

# শুধু মাওবাদীমুক্ত নয়, প্রয়োজন মাওবাদমুক্ত ভারত

১৯৬৭ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে, তখন চীন ও রাশিয়াপন্থী সব দল জোটবদ্ধ হয়। ক্ষমতায় আসার জন্য যে তারা হাত মেলায় তা বলাই বাহুল্য। যদিও এই পুতুল নাচের দড়ি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর হাতেই। কিন্তু ভাগ পায়নি চারু মজুমদার, কানু সান্যালরা। তারা তখন পরিকল্পনাহীন এক বিপ্লব শুরু করে চিকেনস্ নেকের কাছে নকশালবাড়িতে। শুরু হয় ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। পরে দেখা যায় যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ওই এলাকাকে স্বাধীন ঘোষণা করে উত্তর-পূর্বকে আলাদা দেশ হিসেবে ভারত বিভাজনের ক্ষেত্রে চীন যদি একবার সাহায্য করে, তবে উত্তর কোরিয়ার মতো একটা একনায়কতান্ত্রিক দেশ তৈরিতে তারা সক্ষম হবে বলে ভেবেছিল।

এদিকে ইন্দিরা গান্ধী দেখেন যে, হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। ১৯৬৯-এ বাংলা কংগ্রেস থেকে নিজের তৈরি কংগ্রেস (আর) দলে ইন্দিরা নিয়ে আসেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে। প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন নকশালদের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভাগ হয়। ১৯৭২-এ হয় চারু মজুমদারের পতন। সিকিম ভারতে যুক্ত হলে চীন বোঝে উত্তর-পূর্বের স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে হবে আপাতত।

আশির দশকের শুরুতে নকশালরা পালিয়ে যেতে থাকে ঝাড়খণ্ড (তৎকালীন বিহার), ওড়িশা, ছত্তিশগড় (তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ) ও অন্ধ্রপ্রদেশে। ১৯৮০ থেকে প্রথম এক দশক ওখানে জঙ্গলে তারা মিশে যায় এবং তাদের সাংগঠনিক ভিত কীভাবে শক্ত করা যায় তার সমীক্ষা শুরু করে। মাওবাদী নেতারা দেখে যে এখানে পুলিশ ও ভূস্বামীরা সাধারণ জনজাতিদের উপর অত্যাচার করে। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে শুরু হয় মাওবাদীদের সংগঠন তৈরি।

১৯৭৮ সালে আমেরিকার প্রেরণায় চীনের চেয়ারম্যান দেং শিয়াওপিং আর্থিক উদারীকরণ শুরু করেন। সেই সময় ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। রাশিয়া-ভারত একদিকে এবং বিপরীত দিকে আমেরিকা ও চীন। ভারতে যাতে শিল্পক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ না আসে, ভারতে যাতে বৃহৎ শিল্প স্থাপন না হয়, সেই পরিকল্পনা শুরু করে আমেরিকা ও চীন। শিল্পের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— জমি, খনিজ সম্পদ, জলসম্পদ, মানব সম্পদ ও পরিকাঠামো। তৎকালীন ভারত অবশ্য এর একটা বিষয় নিয়েও ভাবিত ছিল না। সেই সুযোগে মাওবাদীরা একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দখল নিতে থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ, হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ারাঙ্গল রিজিয়োনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে এনআইটি, ওয়ারাঙ্গল), আইআইটি বোম্বে, আইআইটি মাদ্রাজে বিস্তৃত হয় তাদের সাংগঠনিক শাখা-প্রশাখা। সর্দার সরোবর প্রকল্পে মেধা পাটেকরের বাধাদান শুরু হয়। বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা খনিজ সম্পদের উপর ভারত সরকারের অধিকার খর্ব করতে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পক্ষে মাঠে নামানো হয় মাওবাদীদের। তিব্বতকে পরাধীন করে রেখে, তিব্বতের জলসম্পদ, খনিজ সম্পদ লুঠ করে, তিব্বতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করে এবং মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনের শিল্পক্ষেত্রের উন্নতি সাধন করতে থাকে। ভারত যাতে নিজস্ব জল ও খনিজ সম্পদ ব্যবহার করতে না পারে, সেই জন্য মাওবাদীদের কাজে লাগানো শুরু করে চীন ও আমেরিকা। তাদের আর্থিক মদতে এবং তাদেরই পাঠানো অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পশুপতি থেকে তিরুপতি পর্যন্ত গড়ে ওঠে 'রেড করিডোর।' খনিজ সম্পদ-সমৃদ্ধ অরণ্যাঞ্চলে সংগঠন বেড়ে উঠতে থাকে মাওবাদীদের।

১৯৮০ সালের পর নেপাল থেকে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের জঙ্গল ও খনি এলাকায় লুকিয়ে পড়ে মাওবাদীরা। তারপরে ধীরে ধীরে জনজাতিদের ভাষা শেখে। তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বোঝা শুরু করে যাতে তাঁদের নিয়ে সংগঠন গড়া যায়। ধীরে ধীরে তৈরি করতে থাকে বা প্রাইভেট আর্মি। দলীয় সংগঠন এবং এই সামরিক বাহিনীর সাহায্যে চালাতে থাকে সমান্তরাল প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় তারাই হয়ে ওঠে শেষ কথা। প্রতিটি অঞ্চলে সংগঠনের উপরে থাকে উচ্চবর্ণের বাঙ্গালি বা তেলুগু এবং উচ্চশিক্ষিত শহুরে লোকজন। আর সংগঠনের নীচুতলায় থাকে জনজাতিরা। বন ও খনি বাঁচানোর আওয়াজ তুলে বিদেশি অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে থাকে তারা। কয়লা কেনার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মুখাপেক্ষী হতে পর্যন্ত বাধ্য হয়, যা ভারতীয় অর্থনীতির বিপুল ক্ষতিসাধন করে।

মাওবাদী প্রতিরোধে ২০০৫-এ সালোয়া জুড়ুম শুরু হলেও ২০০৭ সালে দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্সের অধ্যাপিকা নন্দিনী সুন্দর এর বিরুদ্ধে আদালতে যান। প্রথমে সুবিধা করতে না পারলেও, ২০১০ সালে তার ওজন বাড়ানোর জন্য তাকে ইনফোসিস পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১২ সালে এই মামলায় সরকার হেরে যায়। এরপর সালোয়া জুড়ুমে সাহায্য করা জনজাতিদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করে মাওবাদীরা। ২০১৮ সালে ভারতের ৯০টি জেলায় ফের শুরু হয় মাওবাদী দমন অভিযান। নিপীড়িত বনবাসী ও জনজাতিদের সঙ্গে নেওয়া হয়। ২০২৪-এ ৬টি জেলায় সংকুচিত হয় মাওবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব। এই বছর এপ্রিল-মে মাসে চারদিক থেকে ঘিরে নিকেশ করা হয় তাদের সংগঠন।

১৯৬৭ সালে মাওবাদীদের প্রথম লক্ষ্য ছিল চিকেনস্ নেক কেটে চীনের এক বন্ধুদেশ তৈরি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকে তারা। ১৯৯০-এর দশকে দেশ উন্নতি শুরু করলে জঙ্গল ও খনি এলাকায় তারা ঘাঁটি তৈরি করতে থাকে। কিন্তু এদেরই দোসর 'শহুরে মাওবাদী' বা 'আরবান নকশাল'রা ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম, কর্পোরেট জগৎ, প্রশাসন, আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভারতের অফিস-আদালত, সচিবালয়, মিডিয়া হাউজ, কর্পোরেট হাউজ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, বলিউড, মানবাধিকার সংস্থা বা এনজিওগুলিতে যারা বসে আছে, বিভিন্ন বিষয়ে নানা মহলে প্রতিনিয়ত প্রভাব খাটাচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করতে না পারলে এই রক্তবীজ আগামীদিনে আবার প্রকাশ্যে হাজির হবে। □

# জেহাদি আক্রমণের কবলে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ

**ড. বিনয়ভূষণ দাশ**

অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ১৭ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান সমিতি (সিট) রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে হিন্দুদের ওপর সংঘটিত আক্রমণ নিয়ে তাদের রিপোর্ট হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন, বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চের কাছে জমা দিয়েছে। আর তাতেই হিন্দু হত্যাকারী, লুণ্ঠতরাজে অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, পঞ্চায়েত সদস্য ইত্যাদি পদাধিকারীদের নাম।

আজকের পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর যথার্থ শিষ্যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বাঁড়ুজ্যের রাজনৈতিক স্বার্থেই এই রাজ্যে হিন্দু হত্যা, নির্যাতন হয়; তাঁরই ইঙ্গিতে এই হিন্দু নির্যাতন প্রলম্বিত হয়। প্রদত্ত রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, গত ১১ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে সংঘটিত হিন্দুবিরোধী ঘটনাগুলির সময় জেলার পুলিশ সম্পূর্ণ 'নিষ্ক্রিয় ও অনুপস্থিত ছিল।' শুধু তাই নয়, ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মেহবুব আলম হিন্দুদের উপর এই আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিল। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলম হামলাকারী ওই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসেছিল এবং দুষ্কৃতীদের মদত দিয়েছিল।

সিটের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১১ এপ্রিল ধুলিয়ানে সংঘটিত হিন্দুবিরোধী হিংস্র ঘটনাগুলির সময়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং তাঁদের অনুপস্থিতির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই আক্রমণ শুরু হয়েছিল ৮ এপ্রিল। এই বিশেষ বেঞ্চের নির্দেশে ১২ এপ্রিল সিএপিএফ মোতায়েন করা হয়। ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদ ও ঘোষপাড়া, সুতি ইত্যাদি স্থানের হিন্দুবিরোধী ঘটনাগুলির পেছনে সক্রিয় ছিল মূলত স্থানীয় সন্ত্রাসবাদীরা। এঁদের প্রায় সবারই বাড়ি পার্শ্ববর্তী সামশেরগঞ্জ, হিজলতলা, শিউলিতলা ও দিগরি গ্রামে। এঁরা সকলেই মুখ ঢেকে এসেছিল।

অথচ রাজ্যের শাসকদল মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য কখনো এই আক্রমণের পেছনে বহিরাগত বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে খুঁজেছে, কখনো-বা পার্শ্ববর্তী বিহার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য থেকে আগত দুষ্কৃতীদের দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু সিটের সাম্প্রতিক তদন্ত রিপোর্টে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কাল্পনিক দাবি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁদের প্রতিবেদনে তাঁরা রাজ্য সরকারের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছে, সিএপিএফ আরও আগে মোতায়েন করা হলে অবস্থার এতটা অবনতি হতে পারতো না।

প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী, ওই রিপোর্টে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মেহবুব আলম হিন্দুদের উপর এই আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিল। এই মেহবুব আলম ১১ এপ্রিল ২০২৫ অন্যান্য দুর্বৃত্তদের সঙ্গে এসেছিল। সিটের রিপোর্টে এই মেহবুব আলমকেই মূল চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওইদিন স্থানীয় বিধায়কও উপস্থিত ছিল। সে প্রাথমিক ভাঙচুর দেখে চলে যায়। কিন্তু এই তাণ্ডব ও হিংসা পরবর্তী কয়েকদিনও অব্যাহত ছিল। স্থানীয় পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিল। সিটের সদস্যদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রেজিস্ট্রার (আইন) যোগিন্দর সিংহ, পশ্চিমবঙ্গের আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সত্য অর্ণব ঘোষাল এবং পশ্চিমবঙ্গ বিচারবিভাগীয় পরিষেবার রেজিস্ট্রার সৌগত চক্রবর্তী। এই কমিটিকে জেহাদি হিংসার ফলে বাস্তুচ্যুতদের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও মূল্যায়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, স্থানীয় এমএলএ আমিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে যে বাড়িগুলি তখনও ধ্বংস হয়নি সেগুলিও দুষ্কৃতীদের দেখিয়ে দিচ্ছিল এবং সেই অবশিষ্ট বাড়িগুলি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

এছাড়া ধুলিয়ানের একটি শপিংমলেও লুটপাট করা হয়েছিল। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, বেতবোনা গ্রামের ১১৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও ভাঙচুর করা হয়েছিল। এছাড়া নগদ, অলংকার, আসবাবপত্র ইত্যাদি লুণ্ঠন করা হয়েছিল যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বার বার ফোন করা সত্ত্বেও রাজ্য পুলিশ কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ফোন ধরেনি। অথচ ঘটনাস্থল থেকে থানা মাত্র ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত। বেতবোনা গ্রামের প্রায় চারশোটি পরিবারকে মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার পারলালপুর হাইস্কুলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন তাঁদের যথাযথ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে সকলকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসের হত্যার উল্লেখ করে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই জেহাদিরা তাঁদের বাড়ির মূল দরজা ভেঙে প্রবেশ করে। তাঁরা তাদের প্রতিবেশী ছিল।

সরকার এই জেহাদিদের আড়াল করতে সচেষ্ট ছিল সেকথাও প্রমাণিত হয়েছে। স্থানীয় নাগরিকরা এবং বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই এই স্পর্শকাতর অঞ্চলে স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানিয়েছে। এই রিপোর্ট তৃণমূল কংগ্রেস দলের 'হিন্দু-বিরোধী নৃশংসতাও' সামনে নিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার এমএলএ হুমায়ুন কবিরের মতোই হিন্দু-বিরোধী এই তাণ্ডবের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, তৃণমূল দল-সহ দেশের যে বিরোধী ইন্ডি-জোট সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রচণ্ড বিরোধী তাঁরাই আবার মুর্শিদাবাদে হিন্দু-বিরোধী

**মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুদের বাঁচাতে হলে পুলিশকে দল নিরপেক্ষ ক্ষমতা দিতে হবে, জেলার জনবিন্যাস দ্রুত পালটাতে হবে এবং সর্বোপরি জেলার হিন্দুদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ ও সাহসী হতে হবে।**

ফ ঃ ২

সন্ত্রাসে মুখে কলুপ এঁটে বসে আছে। এক অদ্ভুত বৈপরীত্ব এদের কথায় ও কাজে। আর একটি বিষয় পরিষ্কার, পহেলগাঁও ও মুর্শিদাবাদ উভয় ক্ষেত্রেই জেহাদিরা পরিকল্পিতভাবে বেছে বেছে হিন্দুদের 'টার্গেট' করেছে যেমন তাঁরা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে এ যাবৎ করে এসেছে।

স্বাধীনতার আগে থেকেই বিভিন্ন সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাটিকে মুসলমান প্রধান জেলায় পরিণত করার লক্ষ্যে মুসলমান দুর্বৃত্তরা হিন্দু-বিরোধী 'প্রোগ্রাম' করে আসছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাসের পরে থেকেই ধারাবাহিকভাবে এটা চলে আসছে। এর পেছনে আছে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ। ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীরা ছিল মূলত সৈনিক। তাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন হতো খুবই কম। তাই তারা খাদ্যের প্রয়োজনে এবং জমি জবরদখলের উদ্দেশ্যে ভারতে এসে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করে। ভারতে এসে তাদের রাজত্ব কায়েম করার পর ভারতের একটি বড়ো অংশের মানুষকে তারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে। কিন্তু ভারতে মুসলমান প্রাধান্য স্তিমিত হয়ে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সৈনিকবৃত্তি চলে যায়, পড়াশোনার প্রতি তীব্র অনীহার কারণে তারা কৃষির উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এছাড়া হিন্দুসমাজের যারা ধর্মান্তরিত হয় তারাও ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু তাদের হাতে জমির মালিকানা ছিল না, তা ছিল হিন্দুদের হাতে। ফলে শুরু হয় জমি দখলের লড়াই। কিন্তু স্বাধীনতার পরে তাদের সেই লড়াই কঠিন হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার জমির কর্তৃত্ব মূলত হিন্দুদের হাতেই ছিল পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতোই।

কিন্তু বামফ্রন্টের রাজত্বে শুরু হয় 'অপারেশন বর্গা'। জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, সূর্যকান্ত মিশ্র ইত্যাদি সিপিএম নেতাদের কল্যাণে 'অপারেশন বর্গা'র ফলে অন্যান্য জেলার মতোই মুর্শিদাবাদ জেলায়ও হিন্দুদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে যায় মুসলমানদের হাতে। কিন্তু মুসলমানদের জমির ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। বরং জমির জন্য ক্ষুধা তাদের আরও বেড়ে যায়। তারা স্থির করে, জেলার অবশিষ্ট হিন্দুদের জমি কেড়ে নিতে হবে যে কোনো উপায়েই। ফলে জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে শুরু হয় তাঁদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ। অত্যাচার শুরু হয় হিন্দুদের উপর। জমির ফসল চুরি করে কেটে নেওয়া, জমিতে ফসল নষ্ট করে দেওয়া, পুকুরে বিষ দেওয়া ইত্যাদি শুরু হয় পরিকল্পিতভাবে। এছাড়া পরিকল্পিতভাবে শুরু হয় হিন্দু ঘরের যুবতী মেয়েদের উপর অত্যাচার ও লাভ জেহাদ যাতে গ্রামের হিন্দুরা গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। আর এই প্রক্রিয়া কয়েকগুণ বেড়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে। ফলশ্রুতিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বহু হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম আজ হিন্দুশূন্য। জেলার বাগড়ি অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রাম এইভাবে হিন্দুশূন্য হয়েছে। এমন উদাহরণও আছে যেখানে মুসলমানদের হাত থেকে জমি রক্ষা করতে বাগড়ি অঞ্চলের কিছু জমিদার পরিবার একসময় সিপিএমের নেতা হয়ে যান। তাঁরা একটা সময় অবধি জমিজিরেত রক্ষা করতে পারলেও শেষ অবধি জেহাদি অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হন; যদিও বামপন্থী মানসিকতার কারণে তাঁরা আসল সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পান। গ্রামের মুখোপাধ্যায়, সরকার ইত্যাদি পরিবারগুলি এখন বহরমপুরে এসে নিজেদের কোনোক্রমে রক্ষা করছেন।

সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের কেন্দ্র উঠে এসেছে জেলার রাঢ় অঞ্চলে। সাম্প্রতিক এই জেহাদি আক্রমণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সামশেরগঞ্জ ব্লক। এই ব্লকের জনবিন্যাস তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্লকে ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৮৩.৪৮ শতাংশ এবং হিন্দু জনসংখ্যা মাত্র ১৬.৩৮ শতাংশ। অবশ্য মুর্শিদাবাদ জেলায় মাত্র একটি ব্লক, বড়ঞা এখনো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ; ওই ব্লকে হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ৫৬.৭৬ শতাংশ এবং মুসলমান জনসংখ্যা ৪৩.০৬ শতাংশ। বহরমপুর-সহ বাকি সব ব্লকই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৬৬.২৭ শতাংশ এবং হিন্দু জনসংখ্যা ৩৩.২১ শতাংশ; যদিও বিগত এক দশকের বেশি সময়ে জেলার মুসলমান জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ পার করে ফেলেছে।

সাম্প্রতিক হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় উঠে এসেছে এই সামশেরগঞ্জ ও ধুলিয়ানে। এর বিশেষ কারণ হলো, মুসলমান সমাজের অত্যধিক জমিতৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দুদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দখল নেওয়া। বাগড়ি অঞ্চলে তেমন ব্যবসা না থাকলেও রাঢ়ের এই অঞ্চলে হিন্দুদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা আছে। ধুলিয়ান-ঔরঙ্গাবাদে বিড়ি ব্যবসায় খুব রমরমা। এগুলি বেশিরভাগই হিন্দুদের দখলে ছিল। এছাড়া সাগরদিঘিতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় সেখানেও অনেক ব্যবসা গড়ে উঠেছে। ফলে এই অঞ্চলের ব্যবসাপত্তরের দখল নেওয়ার উদগ্র বাসনায় মুসলমান ব্যবসায় গোষ্ঠী তাদের স্বাভাবিক হিন্দু-বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু উচ্ছেদ করাতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই ধুলিয়ান- ঔরঙ্গাবাদের বিড়ি ব্যবসায়ের বেশিরভাগটাই দখল নিয়ে নিয়েছে।

অথচ এই বিড়ি ব্যবসায়ের প্রায় সবটাই হিন্দুদের দখলে ছিল একসময়। মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফাকচারিং কোম্পানি ছিল মূল বিড়ি ব্যবসায়ী। কিন্তু গত বেশ কিছু বছর হলো পতাকা বিড়ি এদের স্থান দখল করে নিয়েছে। আর হ্যাঁ, এই পতাকা বিড়ি ব্যবসায়ের রমরমার অন্যতম কারণ হলো প্রাক্তন সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অকৃপণ বদান্যতা। উমরপুরে এই পতাকা গোষ্ঠীকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অল্প দামে জমি পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন শিল্পোন্নয়নের অছিলায়। পতাকা গ্রুপ অন্যান্য ব্যবসাতেও নেমে পড়েছে। তিনি এদের শিল্পপতির স্তরে উন্নীত করে দিয়েছেন বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এঁদের অনেকেই সীমান্তে পাচারকারী থেকে একেবারে শিল্পপতির স্তরে উন্নীত হয়েছে। উত্তর মুর্শিদাবাদের বেশিরভাগ তৃণমূল এমএলএ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

সাম্প্রতিক ঘটনায় এই গোষ্ঠীরও পরোক্ষ হাত রয়েছে। বাগড়ি অঞ্চলের মতোই একই লক্ষ্যে, একই পদ্ধতিতে তারা জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে এই অঞ্চলে। আর এই ব্যাপারে তারা 'দোসর' হিসেবে পেয়েছে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের জেলার নেতাদের। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির আগেই হুমকি দিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ৩০ শতাংশ হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবে। আর এখন ওর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমিরুল ইসলাম, মেহবুব আলমরা! হ্যাঁ, আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, এই হুমায়ুন কবির কিন্তু মুর্শিদাবাদের তথাকথিত 'ডন' অধীর চৌধুরীর হাতে গড়া, তাঁর একসময়ের অনুগত শিষ্য।

সুতরাং এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুদের বাঁচাতে হলে পুলিশকে দল নিরপেক্ষ ক্ষমতা দিতে হবে, জেলার জনবিন্যাস দ্রুত পালটাতে হবে এবং সর্বোপরি জেলার হিন্দুদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ ও সাহসী হতে হবে। আর এজন্য চাই রাজ্যে দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন।

নিঃসন্দেহে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস বাংলাদেশে হিন্দুদের পোষ্টারবয়। তাই ভারত যেকোনো রাজনৈতিক চালে তাঁকে মুক্তি করতে পারলে তিনিও বাংলাদেশে হিন্দু হৃদয় সম্রাট হয়ে থাকবেন।

# চিন্ময় প্রভুর মুক্তিতে জেহাদিদের কাছে আত্মসমর্পণ বাংলাদেশ আদালতের

**রঞ্জন কুমার দে**

না, প্রত্যাশিতভাবে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর জামিন হলো না। দেশদ্রোহের মামলায় জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর দেশটির জেহাদি শক্তি রাজপথ, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের আক্রোশ, ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। এমনকী জামাত শিবির এবং সরকার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনকে ভারতীয় শক্তির গোপন নির্দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে আদালত ও সরকারের উপর অলিখিত একটা চাপ সৃষ্টি করে। তাই তাঁকে ভুয়ো ৪টি মামলায় ফের জড়িয়ে জামিন অগ্রাহ্য করা হয়, এর ফলে খোলা আকাশে সন্ন্যাসীর অবাধ বিচরণে আবার অমাবস্যার কালো অন্ধকার নেমে এলো। প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনোদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব কোনো অভিযোগ কিংবা অপরাধেরও যোগসূত্রতা নেই। তাঁর একটাই অপরাধ, তিনি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী কীভাবে সভা-সমাবেশে হিন্দু জাগরণের প্রকাশ্য ডাক দিতে পারেন, ওটাই জেহাদিদের চক্ষুশূলতার প্রধান কারণ। আজ অবৈধ ইউনুস সরকার অপরাধ আসক্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কক্সবাজার, টেকনাফে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে দিচ্ছে, দেশের ভেতরে করিডোর সৃষ্টি করেছে, কিন্তু দেশটির স্বাধীনতায় যে হিন্দুসমাজের ৯০ শতাংশ মানুষ সর্বস্ব দিল আজ তারা সেই দেশের ভেতরেই গৃহহারা, অসম্মানিত, বিতাড়িত।

যে আওয়ামি লিগ বর্তমান সরকার ও ঘনিষ্ঠদের চোখের বালি, সেই দলের অনেকে মুসলমান নেতা এখনো বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন কিন্তু সেই দেশের হিন্দুদের ধুলায় মিশিয়ে দিতে হিন্দু যুবকদের আওয়ামি ট্যাগ লাগিয়ে যখন-তখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে জেল বন্দি করে হিন্দু সমাজকে একটা পরোক্ষ বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে ভবিষ্যতে যাতে কেউ (অমুসলমানরা) এভাবে আর প্রকাশ্যে স্বজাতির জন্য শিরদাঁড়া সোজা না করতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে কিংবা পরে, অনেক হিন্দু নেতা শুধু হিন্দু ভোটের ঠিকাদারি করে গেছেন কিন্তু কেউই এভাবে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পর যখন হিন্দুদের খাঁড়ার উপর দাঁড়ালো তরবারির ঝুলছিল তখন প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস নিপীড়িত নির্যাতিত এই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন, হিন্দুদের মনোবল তৈরির এবং সংগঠিত করতে জেলায় জেলায় করেছেন বিশাল বিশাল সভা, ও মিছিল। তাঁর প্রত্যেকটি সমাবেশে ছিল হিন্দুদের উপচে পড়া ভিড় যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেনি এবং শর্ত একটাই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৮ দফা

দাবি। তাই তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে মোল্লাবাদী সরকারের তাঁকে জেলে বন্দি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না।

সেই আট দফার দাবিতে ছিল সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে হিন্দু ফাউন্ডেশনে উন্নতকরণ, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ট্রাস্টকেও ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ, দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন এবং অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন বাস্তবায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতীপূজার অধিকার এবং হোস্টেলে প্রার্থনা কক্ষ, সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের আধুনিকীকরণ এবং দুর্গাপূজায় পাঁচ দিন ছুটি দেওয়া। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম হিন্দুদের জন্য সাহসিকতায় ভরা এরকম দাবি চাওয়াটাই কাল হলো প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জন্য। ৭১-এর পরাজিত দোসররা তথাকথিত জাতীয় পতাকা অবমাননার বাহানায় প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে জেল হাজতে হিন্দুদের হৃদয়ে আঘাত করেছে। প্রথমে তাঁকে ইসকন, তারপর ভারত এবং আওয়ামি লিগের সঙ্গে জুড়ে দেশের মোল্লাবাদকে পুঁজি করে সরকার এখন পুরো বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু ও ভারত বিদ্বেষে মেতে উঠেছে। দেশদ্রোহ মামলা ছাড়াও তাঁর উপরে অভিযোগ আনা হয়েছিল জমি দখল, মন্দিরের অভ্যন্তরে অনাথ শিশুদের সঙ্গে অবাধ যৌনাচার এবং যৌন হয়রানির মতো কুরুচিপূর্ণ একাধিক অভিযোগ। দেশের প্রথম সারির মিডিয়াগুলোও একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে সর্বোচ্চ কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে সামান্যতম কার্পণ্য করেনি।

বাংলাদেশে কার্যত পাকিস্তান, জামাতপন্থী এবং জেহাদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে। এমনবস্তায় প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে তাঁর ভাষণের প্রত্যকটি বাক্যবাণে মোল্লাবাদীদের রক্তক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। তিনি বলেছিলেন হিন্দুদের জন্য কথা বললে জেলে যেতে হয়, আর হিন্দুদের উপর আক্রমণ করলে জেল থেকে জামিন পাওয়া হয়। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, বিগত সরকার পাঁচশোর বেশি মডেল মসজিদ বানিয়েছে আমরা স্বাগত জানিয়েছি কিন্তু আমরা কী পেলাম! কিন্তু এখন দেশের হিন্দু সমাজের জীবন জীবিকাতে হাত দেওয়া হয়েছে, শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের অপরাধে চাকুরিচ্যুত কিংবা পদাবনতি হচ্ছে। শুধু হিন্দু পরিচয়ে ৯৩ জন পুলিশকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, ভেটেরিনারি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা হয়েছে, প্রকাশ্যেই অন ক্যামেরায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কত যে হিন্দু শিক্ষাগুরুদের লাঞ্ছনা করে, পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটা বিশ্ব দেখেছে। প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস দেশের সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, কারণ ইউনুস সরকার ছ'টি কমিশন গড়েছে কিন্তু সেখানে কোনো সংখ্যালঘু বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নেই।

তিনি বারবার দেশের ঘুমন্ত হিন্দুদের জাগাতে, বোঝাতে চেয়েছেন যে, দেশের সংবিধান সংশোধনে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হিন্দুরা সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকার প্রশ্নই আসে না। প্রবু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস বলেছিলেন— 'আমরা মোগল নই, ওলন্দাজ নই, আমরা ফরাসি নই, আমরা ব্রিটিশ নই, আমরা উড়ে আসিনি। আমরা এই বঙ্গ যিনি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র, বলি মহারাজের পুত্র, সেই বঙ্গ মহারাজ বঙ্গের নামানুসারে যে বঙ্গভূমি, আমরা তার উত্তরাধিকারী। আমাদের এখানে প্রথম অধিকার আছে। আমাদের অধিকারকে অস্বীকার করার কোনো প্রচেষ্টা হিন্দুরা আর মেনে নিবে না।

সাইফুল ইসলাম নামের জামাতপন্থী এক আইনজীবীকে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী ভেবে কুপিয়ে হত্যা করে দেশের মোল্লাবাদীরা (দেশের প্রথম সারির মিডিয়া হাউজগুলো ফলাও করে তখন প্রচার করেছিল), পরে সেটার দায়ও মোল্লাবাদী সরকার ইসকন, প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস এবং সনাতন ঐক্য জোটের ঘাড়ে চাপিয়ে পুরো দেশে মুসলমান সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগায়। শুধু তাই নয়, এই মামলায় প্রায় ১৫০ জনেরও বেশি হিন্দু আইনজীবীর নাম জুড়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভিডিয়ো ফুটেজ তদন্তে ৬ জন ইসলামি শিবির কর্মীর হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপরাধে আটক করলেও পরে বেছে বেছে হিন্দু নেতাদের গ্রেপ্তা করা হয়েছে।

প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রমেন রায় মোল্লবাদীদের আক্রমণে আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল কোনো আইনজীবী যাতে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের হয়ে আদালতে আর না দাঁড়ান। আদালতের অনুমতি সত্ত্বেও তাঁর জন্য ওষুধ ও খাবার নিতে যাওয়ায় পুলিশ তাঁর সেবকদের গ্রেফতার করে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এবং প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারে নিন্দা ও চিন্তা ব্যক্ত করেছিল। দেশদ্রোহের ভুয়ো মামলায় জামিনের পর আবার তাঁর বিরুদ্ধে চারটি মামলা করে তাঁকে আদালতে আবার গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এই চারটি মামলায় তাঁকে আইনজীবী হত্যা, পুলিশের কাজে বাধা, আইনজীবী ও বিচারপতিদের উপর হামলা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ তিনি এই ঘটনাস্থল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে পুলিশের জিম্মায় ছিলেন। আজকাল প্রকাশ্যে জামাত-পাকিস্তানপন্থীরা দেশের পতাকা, জাতীয় সংগীত, সংবিধানকে প্রকাশ্যে অবমাননা করছে, অথচ তাদের ভয়ে পুলিশ-প্রশাসন ও আইন নীরব।

বাংলাদেশে ইসকনকে মোল্লাবাদীরা নিষিদ্ধ করতে চাইছে। রাজপথে স্লোগান দিচ্ছে— 'একটা একটা ইসকন ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর', 'ইসকনের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও'। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জেড আই পান্না স্পষ্ট বলছেন, সরকার চাইছে তাই তাঁকে কারাগারে রাখছে, এখানে আইন সংবিধানের প্রশ্ন তুলে কী লাভ! সরকার কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে খুশি রাখতে কিংবা ভয়ে এরকম লজ্জাজনক কাজ করছে। আমরা দেশের সাধারণ হিন্দুদের কথা যদি বাদও দিই, প্রশাসনে থাকা হিন্দুরাও নিশ্চিন্তে নেই। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও হিন্দু পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হিন্দুদের সরকারি ছাউনিতে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাম দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জেলের ভিতরে থাকা কতটুকু নিরাপদ কিংবা যদি কোনোদিন জামিন পেয়েও যান, তাহলে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা খুবই ক্ষীণ। ভারতের মৌনব্রতে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি আরও জটিল অবস্থায় পৌঁছেছে। নিঃসন্দেহে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস বাংলাদেশে হিন্দুদের পোস্টারবয়। তাই ভারত যেকোনো রাজনৈতিক চালে তাঁকে মুক্তি করতে পারলে তিনিও বাংলাদেশে হিন্দু হৃদয় সম্রাট হয়ে থাকবেন।

□

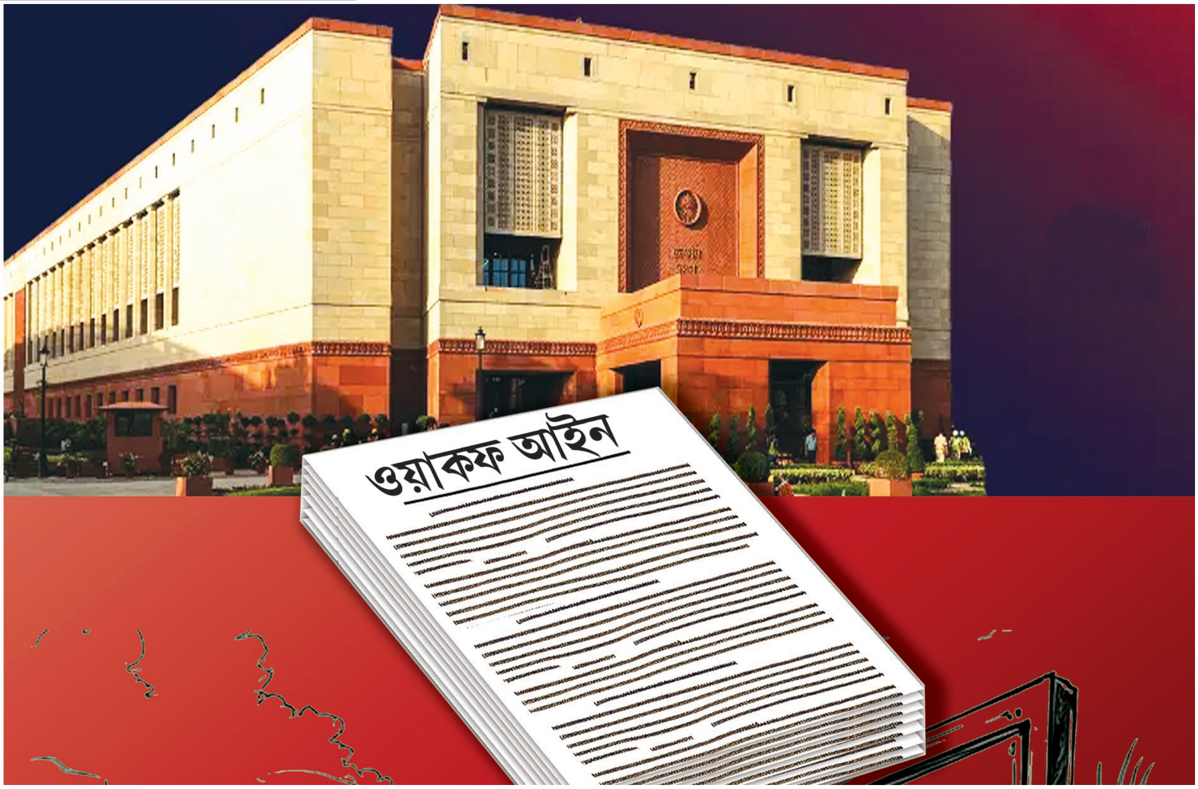


# ওয়াকফ নিয়ে এত অশান্তি নেপথ্যে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজনীতি

(২য় পর্ব)

**কাজি মাসুম আখতার**

উদাহরণস্বরূপ ২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টকে দেখানো যেতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে সারা দেশে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয় হয়েছে মোট ১৮৩ কোটি টাকা। অথচ আয় হওয়ার কথা ছিল ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। সহজেই অনুমেয় যে ২০০৬ সালে ওয়াকফ থেকে যদি এহেন বিপুল আয় হওয়ার কথা হয়, তাহলে ২০২৫-এ এই আয়ের পরিমাণ কত লক্ষ কোটি টাকা হওয়া উচিত। ওয়াকফ থেকে উপযুক্ত আয় বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এতদিনকার বস্তাপচা নিয়মের বা আইনের সংস্কারেরও প্রয়োজন রয়েছে, যা এই সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওয়াকফ সম্পত্তির উপর গড়ে তোলা কোনো দোকান বা বাড়ি থেকে একশো বছর আগে ১০ টাকা ভাড়া নেওয়া হতো। আজও সেই প্রথা মেনে ১০ টাকাই ভাড়া নেওয়া হয়। অথচ আজকের বাজার দর অনুযায়ী ওই ভাড়া হওয়ার কথা কয়েক লক্ষ টাকা। সাচার কমিটির রিপোর্টে ওয়াকফ থেকে আয় বৃদ্ধির এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সুপারিশ করা হয়েছে। আরও উদ্বেগের বিষয় যে, এই রিপোর্টে উল্লেখিত রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ২০০টি। অথচ ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড ওই বিপুল সম্পত্তির মধ্যে মাত্র প্রায় ২০ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তিকে রেজিস্ট্রেশন করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয় বাকি বিপুল সম্পত্তি থেকে আয় তো দূরের কথা, সেগুলি জবরদখল থেকে উদ্ধার করতেও বোর্ড চূড়ান্ত অসফল থেকেছে। বাস্তবে সারাদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যে ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠের রমরমা— তা সাচার কমিটি রিপোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন যে বাম আমলের নেতারা একশো কোটির টাকারও বেশি ওয়াকফ লুঠ করেছে। সিবিআই করে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে মুসলমান সমাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব হলো, পুরানো লুঠ হয়ে যাওয়া ওয়াকফ উদ্ধার তো দূরের কথা, তার শাসনকালে তার আশীর্বাদধন্য মুসলমান সমাজের অসৎ সামাজিক, মজহবি ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান জীবিকাই হলো ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠ। যার অর্থমূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। আরও লজ্জার যে, এই ওয়াকফ লুঠের ষড়যন্ত্রে যুক্ত খোদ ওয়াকফ বোর্ড, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ও ওয়াকফ সার্ভে কমিশনার।

অর্থাৎ রক্ষকই এখানে ভক্ষকের ভূমিকায়। কিছু অসাধু মোতোয়াল্লি (ওয়াকফ ম্যানেজার)-র সঙ্গে যোগসাজশে এই রাজ্যে যে পুকুর চুরি হচ্ছে, তা ভুক্তভোগী-মাত্রই অবগত আছেন। উপরন্তু ভোট রাজনীতির অনিবার্যতায় মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিতে এবং মুসলমান সমাজে প্রভাবশালী ইমাম, মোয়াজ্জেমদের ভোটের কাজে লাগাতে, ওয়াকফ থেকে যে সামান্য আয় হয় তা থেকে ভাতা দেওয়ার নিয়ম বহির্ভূত অপচেষ্টা পুরোদমে চলছে। অর্থাৎ ওয়াকফের অর্থ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে আসল প্রাপকরা। একই চিত্র কম-বেশি সারা দেশেই।

১২. কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডকে পুনরুজ্জীবিত করতে শিয়া, সুন্নি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করে স্বচ্ছতার স্বার্থে, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্বকে মান্যতা দিতে বিশেষ করে আধিকারিক স্তরে ন্যূনতম দুই জন অমুসলমান এবং দুই জন মহিলা সদস্য নিযুক্ত করার বিধি এই আইনে উল্লেখিত হয়েছে। যদিও কাউন্সিল বা বোর্ডে মহিলা সদস্যা রাখার বিষয়টি ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনেও উল্লেখিত ছিল।

১৩. সর্বোপরি, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছ' মাসের মধ্যে জেলা কালেক্টরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ওয়াকফের সকল দাবিদার ওয়াকফের অনুকূলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রদান করে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তকরণ করাবে। যাতে করে প্রমাণ হবে কোন সম্পত্তি ওয়াকফের আর কোনটি নয়। বিতর্ক থাকলে আবেদনকারীরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে।

তাহলে প্রশ্ন, এই নতুন সংশোধনী আইনকে নিয়ে সারা দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এত বিরোধিতা ও বিক্ষোভ কেন? কেনই-বা এই সাম্প্রদায়িক হিংসা? কারা করছে? নেপথ্যে কারা? কোন স্বার্থে? প্রশ্ন, এই বা আশা তাহলে কি দেশের অনগ্রসর, প্রান্তিক মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সত্যিই নিরাশ করেছে? নাকি নিরাশ করেছে কায়েমি স্বার্থান্বেষী ওয়াকফ লুটেরাদের? নাকি এই আইন অস্ত্র হয়েছে রাজনৈতিক কারবারিদের? যারা মোল্লাতন্ত্রকে উসকে দিয়ে মজহবি অসচেতন মুসলমানদের আতঙ্কিত করে ভোটের রাজনীতি করতে চাইছে।

তাহলে কোনটি ঠিক? কিছুদিন আগে এভাবেই সিএএ ইস্যুতে মুসলমানদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে ভোটের বৈতরণী পার করেছিল রাজ্যে মুসলমান ভোটের উপর ভর করে ক্ষমতায় টিকে থাকা শাসক দল। তখন ছিল মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করার ভয় দেখানো। আর এখন তাদের মজহবি সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখানো।

অন্যদিকে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, এই আইন আসলে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রিত করার নামে সুকৌশলে ওয়াকফকে লুটে নেওয়ার গভীর চক্রান্ত। যার মূলে রয়েছে খোদ সরকার তথা কেন্দ্রের শাসক দল। এই আইনের মাধ্যমে তারা যেমন একদিকে খুব সহজে ওয়াকফ সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয়করণ করে তার যথেচ্ছাচার করবে, অন্যদিকে তাদের পরম মিত্র শিল্পপতিদের হাতে 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা'র মতো এই ওয়াকফ সম্পত্তিকে অতি জলের দরে তুলে দিয়ে নিজেদের পকেট ও পার্টি ফান্ডকে গরম রাখবে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত ওয়াকফ বেনিফিশিয়ারি মুসলমানরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে 'ওয়াকফ বাই ইউজার' অর্থাৎ দীর্ঘ যুগ ধরে কোনো কাগজপত্র ছাড়াই যেভাবে মুখে মুখে ওয়াকফ সম্পত্তি সিলমোহর পেয়েছে— তার কী হবে?

সেক্ষেত্রে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা, ১৬ নম্বর ধারা, ২৫ নম্বর ধারা, ২৬ নম্বর ধারা বা ৩০ নম্বর ধারার চূড়ান্ত অবমাননা হবে না? তাছাড়া এই আইন বলবৎ হওয়ার পর দেশের কোণে কোণে বিদ্যমান অজস্র ওয়াকফ সম্পত্তির কোনটি ওয়াকফ আর কোনটি নয়— এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি তাহলে কি হাতছাড়া হবে? ফলস্বরূপ ওয়াকফের নামে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বহু পুরানো কবরস্থান, মসজিদ, দরগা, ঈদগা ইত্যাদি মুসলমানদের অধিকার থেকে কি সরে যাবে? অনেকে আশঙ্কা করছে মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে জোর করে হস্তক্ষেপ ইস্যুতে যে তুমুল বিতর্ক বা মামলা- মোকদ্দমা শুরু হবে— তা নিয়ে দিনের শেষে আগামীতে একাধিক জায়গায় হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। যাতে চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবে মূলত বিপথগামী মুসলমানরাই। যার ছোট্ট নমুনা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সামশেরগঞ্জের ঘটনা।

তাই প্রশ্ন, এই আইন মুসলমানদের প্রাপ্য আইনের রক্ষাকবচকে কোনো ঘৃণ্য স্বার্থে কি সত্যিই উলঙ্ঘন করেছে? নাকি এতদিন ধরে দেশ বা রাজ্যজুড়ে মোল্লা, মাতব্বরের দল, যারা নীরবে, নির্বিঘ্নে ওয়াকফ সম্পত্তিকে লুঠ করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে, এই সংশোধনীতে তাদের স্বার্থহানি ঘটেছে?

তারা যাতে এই পরম্পরাকে পুনরায় চালিয়ে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যে কি রাজনীতির কারবারিদের ইন্ধনে এবং অসচেতন, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, কর্মহীন মুসলমান তরুণদের ধর্ম ও অর্থের টোপ দিয়ে এহেন অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে? কোনটি সঠিক? তা আগামী দিনে বলবে। ততদিন না হয় অপেক্ষায় থাকি। সবচেয়ে উদ্বেগের যে, বিতর্ককারীরা এতদিনের অব্যবস্থা দূর করে ওয়াকফ কীভাবে স্বচ্ছ, সুনিয়ন্ত্রিত অসহায় প্রাপকদের হিতে কাজ করবে তা নিয়ে ভাবিত নয়। তাদের যত হুল্লোড় ওয়াকফ কাউন্সিল ও বোর্ডে কেন অমুসলমান সদস্য থাকবে, কেন সরকারের অধীনে থাকা জেলা কালেক্টরকে ক্ষমতা প্রদান করা হবে ইত্যাদি প্রশ্নে। তাদের মূল আতঙ্ক এই আইনের মাধ্যমে নাকি কেন্দ্র সরকার মুসলানদের ওয়াকফ লুটে নিতে বা সরকারীকরণ করতে চক্রান্ত করছে।

প্রশ্ন হলো, এই ওয়াকফ দরদিরা স্বাধীনতার ৭৭ বছর ধরে ওয়াকফ বিশৃঙ্খলা ও লুঠ দেখেও চুপ ছিলেন কেন? কেন এত বিপুল পরিমাণের ওয়াকফ সম্পত্তির আশীর্বাদ থেকে এতদিন ধরে প্রকৃত প্রাপক মুসলমানরা বঞ্চিত হয়েছে? এই বঞ্চনাকারী লুটেরাদের দল মুসলমান বলে কী এহেন নীরবতা? আল্লার বিধান কি এই নীরবতাকে মান্যতা দেয়? তাহলে মুসলমান হলেই সব পাপ মাপ? প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার এতদিন ধরে এই অন্যায় বরদাস্ত করেছিল কীসের স্বার্থে? প্রশ্ন করবেন না, কেন সিএএ বিরোধিতা এবং বর্তমানের ওয়াকফ আইন বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আজও কোনো প্রস্তাব নিলেন না বা আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে গেলেন না? রাস্তায় হুল্লোড় না করে এটাই তো ছিল সমস্যা সমাধানের প্রধান পদক্ষেপ। অথচ নিজেকে রাজ্য তথা দেশের মুসলমানদের রক্ষাকর্তা বলে সর্বদা দাবি করে তিনি কি নিদারুণ দ্বিচারিতায় শুধু ভোটের খেলা খেলে গেলেন। মুসলমান সমাজের স্বঘোষিত সমাজপতিরা অসচেতন মুসলমানদের কাছে এই চালাকি ধরিয়ে দিতে কি কোনো ভূমিকা পালন করেছেন, নাকি তাদের অসচেতনতার সুযোগকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন দশকের পর দশক ধরে? পাপ যে বাপকেও ছাড়ে না। মুসলমানদের মনে রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এদেশে মুসলমানদের রক্ষাকবচ। তাকে তারা যেন হেলায় না হারায়।

*(সমাপ্ত)*

*(লেখক ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'শিক্ষারত্ন' সম্মাননায় ভূষিত শিক্ষাবিদ)*

# সন্ত্রাসমুক্ত অরণ্য : অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট ও লাল সন্ত্রাসের শেষ অধ্যায়

**সাধন কুমার পাল**

নিঃশব্দে রাত ভেদ করে, গভীর অরণ্যের আঁধারে যখন দেশ ও বিপ্লবের মুখোমুখি লড়াই চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল— ঠিক তখনই ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো। ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড় অরণ্যে 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' নামে পরিচালিত এক রোমহর্ষক অভিযানে শেষ হলো ভারতের অন্যতম কুখ্যাত ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের মাওবাদী নেতা নম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজুর জীবন। এই এক অভিযানেই কেঁপে উঠেছে ভারতের মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি— শুধু একজন শীর্ষ নেতার মৃত্যু নয়, বরং একটি চরমপন্থী মতাদর্শের চরম বিপর্যয়।

এই ঘটনার অভিঘাত শুধু জঙ্গলে সীমাবদ্ধ নেই, এর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক মহল, বুদ্ধিজীবী মহল এবং তথাকথিত 'লেফট-লিবারেল' ইকোসিস্টেমেও। একদিকে সরকার যখন লাল সন্ত্রাসের মূল কাণ্ডারিদের নির্মূল করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে কিছু মুখোশধারী শহুরে মাওবাদী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই অভিযানের নৈতিকতা ও মানবাধিকারের পাঠ পড়াতে।

এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব কেমনভাবে বাসবরাজুর পতন একটি উগ্রপন্থার পতনেরও ইঙ্গিত দেয়, কেমনভাবে সরকার পরিচালিত 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' ভারতের নিরাপত্তা নীতিতে এক মাইলফলক হয়ে উঠেছে এবং কীভাবে এই সংঘাত উন্মোচন করছে ভারতের রাজনীতি, সমাজ ও তথাকথিত প্রগতিশীলতার অন্তর্গত দ্বন্দ্বকে। নম্বালা কেশব রাও, যিনি বাসবরাজু নামেও পরিচিত, গত ২১ মে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড় জঙ্গলে একটি বড়ো মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে নিহত হন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক এবং ওই দলের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের শীর্ষ কমান্ডার ছিলেন। গত তিন দশকের মধ্যে নিহত সর্বোচ্চ পর্যায়ের মাওবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত বাসবরাজু।

এই অভিযানে ৩১ জন মাওবাদী এবং একজন ডিআরজি সদস্য নিহত হয়। রাওয়ের মাথার উপর সম্মিলিতভাবে ১ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল এবং তিনি বহু প্রাণঘাতী হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০১০ সালে ৭৬ জন সিআরপিএফ জওয়ানের হত্যা এবং ২০১৩ সালে ঝিরাম ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে হত্যা-সহ আরও মারাত্মক সমস্ত ঘটনার মাস্টারমাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন এই বাসব রাজু। তাঁর মৃত্যু মাওবাদী কর্মকাণ্ডের জন্য একটি বড়ো ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ এই মৃত্যু মাওবাদী কর্মকাণ্ডকে নেতৃত্বহীন করে ফেলেছে এবং তাদের কার্যক্ষমতায় বড়ো রকমের আঘাত এনেছে। ভারত সরকার এই ঘটনাকে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে নকশালবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে একটি বড়ো অগ্রগতি হিসেবে দেখছে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবার একবার অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে 'লেফট লিবারেল-ইসলামি-ইভানজেলিস্ট' ইকোসিস্টেম। কারণ এই সিস্টেমের সেনাপতিরা ভারত সরকারের মাওবাদী নির্মূল অভিযানকারীদের জালে উঠেছে। জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরা পড়লে যাদের মাথার দাম উঠেছিল কোটি কোটি টাকা সেই সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের জালে রাঘববোয়াল ধরা পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যারা ভারতবর্ষকে চীনের মতো কয়েদ খানা কিংবা দারুল ইসলামের চারণভূমি অথবা ভ্যাটিকানের অনুগামী করে তুলতে চায়, তারা আর বসে থাকে কী করে! বিশ্বজুড়ে এরা পরস্পর লড়াই করলেও ভারতবর্ষে এরা এক হয়ে লড়ছে। যারা কিনা বলে

বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, সেই রক্তপিপাসু মাওবাদী নেতাদের 'গরিবের বন্ধু', 'বঞ্চিতের আওয়াজ' ইত্যাদি তকমায় ভূষিত করে ভারত সরকারকে গণতন্ত্রের পাঠ পড়াতে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পাঠ পড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই ইকোসিস্টেম। এদের বক্তব্য শুনলে যে কোনো মানুষ ভড়কে যেতে বাধ্য। এরা উচ্চশিক্ষিত মুখোশধারী সন্ত্রাসবাদী। এদের হাতে অস্ত্র থাকে না। কলম ও ক্যামেরা হচ্ছে এদের মূল অস্ত্র। সিপিআই(এমএল) লিবারেশন শীর্ষ মাওবাদী নেতা বাসবরাজুর হত্যার ঘটনাকে ঠাণ্ডা মাথায় 'বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' বলে অভিহিত করেছে।

সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, বাসবরাজুর হত্যাকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ''ছত্তিশগড়ে একজন সিনিয়র মাওবাদী নেতা এবং বেশ কয়েকজন জনজাতি মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে সিপিআই। এটি বিদ্রোহ দমন অভিযানের আড়ালে বিচার বহির্ভূত পদক্ষেপের আরেকটি উদাহরণ। আইনসম্মত গ্রেপ্তারের পরিবর্তে বারবার প্রাণঘাতী শক্তির ব্যবহার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আইনের শাসনের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করে।'' মাওবাদী নেতাদের সরকারের প্রতি খোলা চিঠি : 'অপারেশন কাগার' বন্ধ করে শান্তি আলোচনার আহ্বান ও অস্ত্রবিরতির আবেদনে ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল, সিপিআই (মাওবাদী) মুখপাত্র অভয়ের মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায় যে তারা অবিলম্বে অস্ত্রবিরতি চায় এবং সরকার যদি মাওবাদী বিরোধী সামরিক অভিযান বন্ধ করে এবং ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার মতো এলাকায় নিরাপত্তা শিবির তুলে নেয়, তাহলে তারা শান্তি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। তারা দাবি করে, গত ১৫ মাসে 'অপারেশন কাগার'-এর নামে ৪০০-রও বেশি মাওবাদী সদস্য ও জনজাতি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে। এছাড়াও, তারা নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বেআইনি আটক, মহিলা যোদ্ধাদের ওপর যৌন হিংসা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে।

গত ২১ এপ্রিল থেকে ১১ মে ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত ২১ দিনব্যাপী 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' মাওবাদীদের একটি পরিচিত শক্ত ঘাঁটি কারেগুত্তালু পাহাড় (কেজিএইচ)-কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল। অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টের সাফল্যের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকজন সিনিয়র মাওবাদী কমান্ডারকে নির্মূল বা আহত করা, যার

*অভিযানে নিহত শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা বাসবরাজু*

মধ্যে মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা পিপলস লিবারেশনে গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)-র নেতারাও ছিলেন। এই অপারেশনে ১৬ জন মহিলা-সহ মোট ৩১ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে এবং ২০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে ১.৭২ কোটি টাকা সমষ্টিগত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। মাওবাদী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই অভিযানটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এর ফলে ৪৫০টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), ৮০০টিরও বেশি ব্রিগেড গ্রেনেড লঞ্চার (বিজিএল) শেল এবং বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও, মেগা অভিযানের সময় প্রায় ১২ হাজার কিলোগ্রাম খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

বিজিএল শেল, ঘরে তৈরি অস্ত্র এবং আইইডি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কমপক্ষে চারটি প্রযুক্তিগত ইউনিট সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছে। অভিযানের সময় ২১০টিরও বেশি মাওবাদী আস্তানা (গুহার মতো বাঙ্কার) সফলভাবে শনাক্ত এবং ধ্বংস করা হয়েছে। মাওবাদীদের কারিগরি বিভাগ এই আস্তানাগুলিকে অস্ত্র তৈরির ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করছিল। এই বাঙ্কারগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করে কারেগুত্তালু পাহাড়কে নিষিদ্ধ মাওবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের নিরাপদ স্বর্গ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। সিআরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মাওবাদী নির্মূল করার সংকল্প পূরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ৩১টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছি এবং এটি ১২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং আমাদের কাছে তথ্য আছে যে এই অভিযানে আরও বেশি সংখ্যক মাওবাদীকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ৩১ জন মৃত মাওবাদীর মধ্যে ২৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এই অভিযানের নামকরণ করা হয়েছিল অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট এবং কোবরা, সিআরপিএফ এবং ছত্তিশগড় পুলিশের দল এই অভিযানে সামিল ছিল। এত বড়ো মাপের জঙ্গি দমন ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা আগে ঘটেনি। এটি আমাদের জন্য একটি বড়ো সাফল্য।

এটি উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী বছরের মার্চ মাসের আগেই দেশ থেকে 'লাল সন্ত্রাস' নির্মূল করার সংকল্প নিয়েছে। এর আগে সরকার ঘোষণা করেছিল যে, দেশে মাওবাদী সন্ত্রাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির সংখ্যা ২০১৪ সালে ৩৫টি জেলার তুলনায় কমে ৬টিতে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে নিরাপত্তা বাহিনী নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারকারী এলাকাগুলিতে ৩০০টিরও বেশি নিরাপত্তা শিবির স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। মাওবাদীদের অবাধ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে প্রশাসন দুর্গম এলাকাগুলিতে উন্নয়নের কাজ দ্রুত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে অভিযান জোরদার করেছে, তাদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে স্থানীয় মাওবাদী ক্যাডারদের আত্মসমর্পণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র বছরের প্রথম চার মাসে ৭০০ জনেরও বেশি মাওবাদী ক্যাডার কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারতজুড়ে, বিশেষ করে ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা ও কেরালায় মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতা নিরাপত্তা অভিযানের তীব্রতা, মাওবাদী আদর্শের প্রতি মোহভঙ্গ এবং সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রতি আকর্ষণের সংযুক্ত প্রয়াসের সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। নেতৃত্বের ধারাবাহিক পতন, অভ্যন্তরীণ হতাশা এবং সরকারিভাবে গৃহীত সক্রিয় নীতিমালার সম্মিলিত প্রভাবের ফলে মাওবাদীদের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে শুধু বস্তার অঞ্চলে কিছু সশস্ত্র ক্যাডার অবশিষ্ট রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করার লক্ষ্যে আশাবাদী।

## স্বস্তিকার সংখ্যা সংরক্ষণযোগ্য

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত এপ্রিল মাসের ১৪, ২১ ও ২৮ তারিখের সংখ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিষয়ে লেখা পড়ে মনটা ভরে গেল। তিনটি সংখ্যাই সংরক্ষণযোগ্য। কিন্তু সেই সময় অর্থাৎ ষাটের দশকের থেকে জরুরি অবস্থার সময় পর্যন্ত ৭০ দশকের যারা পশ্চিমঙ্গের সঙ্ঘকে তন-মন-ধন দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক লেখা দেখলাম। তাঁদের সঙ্গে ছবিও ছাপা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী মাস্টার মশাইয়ের কোনো ছবি বা তাঁর উপর কিছু লেখা, দৃষ্টিগোচর হলো না। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বর্ধমানের মহন্তস্থলে ১৯৬৫ সালে প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করতে গিয়ে। মাস্টারমশাই ওই বর্গে সর্বাধিকারী ছিলেন। বর্গ কার্যবাহ ছিলেন পান্নালাল বকশী। তিনি তখন মনে হয় বর্ধমান নগর প্রচারক ছিলেন। বাড়ি ছিল অসমের শিলচরে। মুখ্যশিক্ষক ছিলেন শ্যামমোহন দে। সেই সময় মাস্টারমশায়ের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম। তাঁর মুখে শোনা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ও শ্রীহনুমান চরিত্র প্রবচন সন্ধ্যার সময় শুনেছিলাম। দু'দিন তাঁর প্রবচন হয়েছিল।

তাছাড়া মাস্টারমশাই বহুবার আমাদের সিউড়ি নগরে এসেছেন বিভিন্ন কার্যক্রমে। আরেকজনের কথা উল্লেখ হয়নি। বঙ্গের প্রথম বাঙ্গালি প্রচারক রামপ্রসাদ দাস। রামদার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। খুব রসিক লোক ছিলেন। রামপ্রসাদদা একবার শ্যামাপ্রসাদ জয়ন্তীতে সিউড়ি শহরে এসেছিলেন। ঘরোয়া বৈঠকে তাঁকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম— রামদা, কমিউনিস্ট কথার অর্থ কী? তাঁর মুখে উত্তর শুনছিলাম, রসিকতা করে বলেছিলেন। আরে, যারা কম কম করে দেশের অনিষ্ট করে অর্থাৎ স্লো পয়জন, তারাই হলো কমিউনিস্ট। সেই সময় যারা উপস্থিত ছিল সকালে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। এরকম রসিক ছিলেন রামপ্রসাদদা। এই দুইজনের বিষয়ে কিছু লেখা থাকলে সংখ্যা তিনটি আরও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতো। পরবর্তীতে অবশ্যই এই ধরনের লেখা থাকা চাই। বর্তমান প্রজন্মের স্বয়ংসেবকরা এদের সম্বন্ধে কিছু জানে না। স্বস্তিকার মাধ্যমে তা জানা যাবে। সম্পাদকীয় বিভাগ এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করলে খুব ভালো হয়।

—**সুনীল কুমার বিষ্ণু,**
সিউড়ি, বীরভূম।

## 'তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা' মমতা

তিনি তো রবীন্দ্র অনুরাগী, তাই এই উপমা। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি আক্রমণের আগেই ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সুতি, বেদবোনা, সামশেরগঞ্জ, জাফরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে জেহাদি আক্রমণ। পহেলগাঁও ও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সন্ত্রাসী আক্রমণের লক্ষ্য ছিল হিন্দুরা। পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন হিন্দু পর্যটকদের চিহ্নিত করে স্ত্রী-সন্তানের সামনে হত্যা করা হয়। আর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদেও ২ জন হিন্দুকে স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনের সামনে হত্যা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছিল। উভয় ঘটনার নৃশংসতা একই ধরনের। পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার ভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অধীনে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মমতা ব্যানার্জি কাউকে মাথা ঘামাতে দেন না। প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর সেতুতে সৈন্য মোতায়েন হলে মমতার গর্জন বঙ্গবাসী শুনেছে। সেই সময় নবান্ন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের ব্যাপার। এমনভাবে বলা হয় যেন কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে মোটেই অবগত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আছে সিআইডি। তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে সেনাবাহিনী। মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর মমতার গর্জন শোনা যায়নি। অনেক পরে বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করে জানিয়ে দেয় সীমান্ত পেরিয়ে লোকজন এসে পশ্চিমবঙ্গকে বদনাম করার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

পহেলগাঁওয়ের নারকীয় ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দেন কোনো সন্ত্রাসীদের এবং তাদের মদতদাতাদের ছাড়া হবে না। ঘরে ঢুকে মারা হবে। পাতালে গেলেও পার পাবে না। যেমন কথা তেমন কাজ। ঘটনার ঠিক আঠেরো দিনের মাথায় কুড়ি মিনিটের মধ্যেই জঙ্গিদের ন'টি ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতের সেনাবহিনী ভারতে থেকে পাকিস্তানের ভিতরে প্রত্যাঘাত করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরাক্রমে পাকিস্তানের হৃদ্‌কম্পন শুরু হয়। প্রশ্ন, মমতা ব্যানার্জি তার পুলিশ ও সিআইডি দিয়ে জেহাদিদের শায়েস্তা করতে পারতেন। না, তা তিনি করেননি। তার মুসলমান ভোটব্যাংকের ক্ষতি হোক তা তিনি চাননি। মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পথে। বিধানসভাও তার হাতে আক্রান্ত হয়েছিল। তার সামনে শুধু রাজনীতি। নরেন্দ্র মোদীর উত্থান দেশভক্তির পাঠ নিয়ে। তিনি 'দেশ সর্বোপরি' মানেন। তাঁর কাছে রাজনীতির চেয়ে রাষ্ট্রনীতি অনেক বড়ো। মমতা ব্যানার্জি এই পথে কোনোদিন নরেন্দ্র মোদীর স্থান দখল করতে পারবেন না। মোদীজী তাই গাইছেন, 'আমার হাতে রয়, তোমার হাতে ক্ষয়।'

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

## যে জাতি নিয়ম মেনে জীবন- যাপন করে, সে জাতি সফল হয়

দুর্ভাগ্যবশত প্রত্যেক হিন্দুর স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম আলাদা। স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম পরীক্ষিত নিয়ম হয়। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের

দিনক্ষণই হলো স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম। এজন্যই তাকে সংস্কার বা বিশ্বাস বলে। তাই প্রবাদ আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর! আমার মতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সংস্কারকে গবেষণা করে সুনিশ্চিত করা উচিত, আজকের দিনে সেই সংস্কার পালন করার যুক্তি আছে কিনা।

উদাহরণ : ব্রাহ্মমুহূর্তে (সূর্য উদয়ের ৪৮ মিনিট আগের সময়কে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত) ঘুম থেকে উঠে ৪০০-৫০০ মিলিলিটার উষ্ণ গরম জল পান করে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, প্রাণায়াম করার পর, সূর্যোদয়ের পরে ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে, বাড়ি গিয়ে দুধ বা দই-সহ চিড়া মুড়ি দিয়ে প্রাতরাশ করতে হয়। এই নিয়ম মানলে উপকার হয়। কী উপকার হয়, সেটা আমরা জানতাম না। কিন্তু এই নিয়ম পালন করে সবাই উপকৃত হয়েছে। কীভাবে হয়েছে, সেটা পশ্চিমি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছে।

সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে উঠতে হয়। ঘুম ও জেগে থাকা নিয়ন্ত্রণ করে মেলাটোনিন হরমোন। সূর্যাস্তের পরেই শরীরে মেলাটোনিন হরমোন ক্ষরণ বাড়ে (রাত ১০টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত মেলাটোনিন হরমোনের পরিমাণ বেশি হয়), মেলাটোনিন আমাদের শরীরকে ক্লান্ত করে, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হবার হরমোন Cortisol ক্ষরণ শুরু হয়। সূর্যোদয়ের পরে যদি ঘুমাই তখন Cortisol ও Melatonin একই সঙ্গে ক্ষরণ হয়, যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এ জন্যই দিনেরবেলা ঘুমালে গা ম্যাজম্যাজ করে। যতটা জানি, সপ্তম প্রহর থেকে (সূর্যোদয়ের ৩ ঘণ্টা আগে থেকে) মেলাটোনিন হরমোন ক্ষরণ কমতে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা রাতে একনাগাড়ে ঘুমালে ব্রেনের নিউরোন পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় এবং সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

সকালে উঠে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গরম জল পান করলে নানা উপকার হয়, মল-মূত্র ত্যাগ সহজ হয়। মল-মূত্র ত্যাগ হলেই শরীর সুস্থ লাগে এবং অন্য কাজ করতে উৎসাহ আসে। এরপর প্রাণায়াম ও ব্যায়াম করলে শরীরে অনেক ধরনের উপকার হয়। এসব লিখলে এই লেখার আয়তন বাড়বে, কেউ আর পড়বে না। এরপর স্নান করলে শরীর উপযুক্ত হয়। ভোরের সূর্যের আলোয় ইউভি রশ্মি কম (সকাল ১০টা পর্যন্ত) থাকে এবং শরীরে ভিটামিন ডি বেশি তৈরি হয়। আর ভিটামিন ডি আমাদের ইমিউন শক্তি বাড়ায়, অনেক রোগ হতে বাধা দেয়।

আপনি যতই দুধ দই খান না কেন, যদি শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন- ডি না থাকে, দুধ দইয়ের ক্যালসিয়াম দিয়ে শরীরের কোনো উপকার হয় না। শরীরে যে আড়াই কিলোর মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, যে ব্যাকটেরিয়া খাদ্য থেকে উপকারী দ্রব্য আলাদা করে আমাদের রক্তে পাঠায়, সেই ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি হয় টক, ঘোল, মাঠা খেলে। আর ধ্বংস হয় অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য অখাদ্য খেলে। আপনি ব্লাড সুগার কমাতে যতই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান না কেন, আপনার শরীরে যদি সেই ফাইবার খাবার হজম করার বন্ধু ব্যাকটেরিয়া না থাকে, আপনার পেটে গ্যাস হবে, আপনি হজম করতে পারবেন না। পেটে গ্যাস হলে অস্বস্তি হবে, মাথা গরম হবে, কোনো কাজে মন বসাতে পারবেন না। তাই আপনাকে নিয়মিত সকালে টক দই, মাঠা, ক্ষীর খেয়ে সেই বন্ধু ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

খাবার হলো ওষুধ। যে সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খায়, তাকে আলাদা করে ওষুধ খেতে হয় না। না বুঝেও একটা হিন্দু সংস্কার মানলে, আপনার কত উপকার সেটা বোঝা দরকার। আমাদের দেশে ঝগড়া মারামারি কমে যাবে, যদি মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খায়। রান্নায় পিঁয়াজ রসুনের ব্যবহার পেটে গ্যাস বাড়ায়। কাঁচা পিঁয়াজ রসুন চিবিয়ে খেলে উপকার হয়। মা বলেন, যারা পিঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না খাবার খায়, তাদের মাথা গরম থাকে। কেন থাকে এখন বুঝি। হতে পারে নিয়মিত খেলে শরীর সেটা সহ্য করে নেয়। আয়ুর্বেদিক খাদ্য ও জীবন ধারণের নিয়মের উপকারিতা পশ্চিমি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন, তাই আজকাল জার্মানিতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে ৩ দিন নিরামিষ খাবার খেতে দেওয়া হয়।

—**মৃণাল মজুমদার,** বার্লিন, জার্মান।

## সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান পুনরুত্থান হোক

বনগাঁ কলেজ রোড খয়রামারিতে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা ও বঞ্চনাতে ভগ্নদশা এবং জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে চতুষ্পাঠী অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চাকেন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র টোল। স্বাধীনতার আগে থেকেই এখানে সংস্কৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃত চর্চা হতো। পরবর্তীকালে কোনো এক অজানা কারণে এই শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ছোটোবেলায় শুনেছি এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম পণ্ডিত, দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন আমাদের বাবা- জ্যাঠাদের সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য। আমরা যদিও এই টোলকে দেখেছি বন্ধ অবস্থায়। বর্তমানে এখানে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চলে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায়। নির্বাচনের সময় এই চতুষ্পাঠী ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের আবেগ ও ভালোবাসার স্থান এই টোলপ্রাঙ্গণ। বনগাঁর সাধারণ মানুষের দাবি, হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই টোল প্রাঙ্গণকে সাজিয়ে তোলা হোক, এই চতুষ্পাঠী পুনরায় সংস্কৃত চর্চা এবং সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াক।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের কাছে এবং হেরিটেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখছি, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই চতুষ্পাঠীর পুনর্জীবনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংস্কৃত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠুক। বনগাঁ মহকুমাতে একমাত্র দাঁড়িয়ে থাকা এই টোল সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারে একটি অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। আশা রাখি কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে এই চতুষ্পাঠী অধিগ্রহণ করে সংস্কৃত চর্চা ও শিক্ষার প্রসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
খয়রামারি, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

# সময়ে মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়

মৌ চৌধুরী

কথায় বলে, মা হওয়া মুখের কথা নয়। চাইলেই সন্তানকে পৃথিবীতে আনা যায় না। এজন্য দরকার স্বামী-স্ত্রী দুজনের সহমত পোষণ। একজন শিশুর পৃথিবীতে আগমনের আগে অনেকগুলো ধাপ থাকে। মায়ের স্বাস্থ্য, বাবার স্বাস্থ্য। তার উপরে থাকে দুটি পরিবারের বংশগত কিছু সমস্যা। বাবা, মা দুজনেই যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, তখনই সুস্থ একজন সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। বর্তমান যুগে শারীরিক মানসিক সমস্যা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে অনেক পুরুষ ও নারী সুসন্তান জন্ম দেওয়ার উপযোগী নন। মায়ের দিকের অনেক সমস্যা থাকে। বাবার দিকেরও সমস্যা থাকে। তখন চিকিৎসকের সুপরামর্শ নিয়ে সন্তানকে পৃথিবীতে আনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে নারীর গর্ভধারণ সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে যদি নারী থাইরয়েড আক্রান্ত থাকে কিংবা ফ্যালোপিয়ান টিউবে কোনো সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে সন্তান ধারণ করা সম্ভব হয় না। আবার যদি পুরুষের শুক্রাণু সুস্থ না থাকে কিংবা পরিমাণগতভাবে কম হয়, তাহলেও নারীর গর্ভধারণ করা সম্ভব হয় না। বর্তমান যুগে টেস্টটিউব বেবি কথাটা আমরা সকলেই জানি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টেস্টটিউব বেবির মাধ্যমে নারী গর্ভবতী হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে যে জাইগোট তৈরি হয় তা নারী দেহের ডিম্বাশয়ে স্থাপন করা হয়। এটা একটা পদ্ধতি। সুগার, প্রেশার, থাইরয়েড থাকলে চিকিৎসার মাধ্যমে আগে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। তারপর ভ্রূণ স্থাপন করা হয়। আগে এতো জটিলতা ছিল না। প্রকৃতির নিয়মে মা হওয়া স্বাভাবিক একটা বিষয় ছিল।

আগের দিনে মায়েরা গর্ভবতী অবস্থায় গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। তাদের স্বাভাবিক প্রসব হতো। এখন তো বেশিরভাগ শিশুর জন্ম সিজার করে হয়। এখন মেয়েদের মধ্যে ড্রিঙ্ক করার প্রবণতা বেড়েছে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস একদম পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে বহু কিছু স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে চলে গেছে। জীবনটাও অনেক জটিল হয়ে গেছে। বন্ধ্যাত্বের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এইসব কারণে শুধু নয়, বেশিরভাগ মেয়েই বিয়ের পরে সহসা সন্তান নিতে চায় না। সন্তান নেওয়াটা তাদের কাছে একটা বোঝা মনে হয়। ফলে বিভিন্ন রকমের ওষুধপত্র সেবন করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, বয়স  বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রেও একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়। বেশি বয়সে সন্তান ধারণ করলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। বিবাহের পরে সে বিয়ে কতদিন টিকবে বর্তমান যুগে সেটাও একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। চাকুরিরতা মেয়েরা তো ভাবে সন্তান নেওয়া খুবই সমস্যা। অনেকে আবার ফিগার মেন্টেন করতে ব্যস্ত। সন্তান মানুষ করার চিন্তাভাবনাও থাকে না মাথায়। একান্নবর্তী পরিবার আর নেই। একা একা ফ্ল্যাট নির্ভর জীবন। থাকা-খাওয়া, আনন্দ-ফুর্তি এটাই তাদের কাছে বড়ো বিষয়। এরপর স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হলে খোলা রইল ডিভোর্সের দরজা। ফলে সন্তানের মুখ দেখা আর সম্ভব হয় না।

এখানেই শেষ নয়, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা ভুলে যায়। একটা সময় যদিও-বা মনে হয় মাতৃত্বের স্বাদ নেবে, তখন দেখা যায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফলে বহু নারী এখন সন্তানহীনা। ঠাকুমা, দিদিমা, দাদু এই শব্দগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নাতি-নাতনি মানুষ করার মতো সেদিনগুলো আর নেই। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা অনেক কিছু ধ্যানধারণাকে পালটে দিয়েছে। মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েরা নিজেরা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক যে গুরুজন বলে যে ব্যাপারটা আছে তা মানতেই চায় না। নিজেদের সিদ্ধান্তই তারা বহাল রাখে। আর ভালোবাসা এখন তো খেলনাবাটিতে দাঁড়িয়েছে। আজ একে ভালো লাগে তো কাল আরেকজনকে ভালো লাগে। আজ সংসার পাতলো, কাল গুটিয়ে ফেলল। আর যারা সন্তান পৃথিবীতে আনলো কিন্তু তাকে মানুষ করার দায়িত্বও নিল না। আবার নতুন করে অন্য আরেকজনের সঙ্গে ঘর বেঁধে নিল। তাহলে মাতৃত্বের সাধ আর কোথায় পেল। এই আধুনিক সংসারগুলোর সমাজের কাছে কী পরিচয়, কী তাদের ভবিষ্যৎ, সেটা নিয়ে একবারও ভাবে না। বর্তমান নবপ্রজন্মের কাছে একটাই আবেদন, তারা একটু চিন্তাভাবনা করুন। প্রেম ও ভালোবাসা শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে নয়, পরিবারের মধ্যে বিলিয়ে দিন। সুস্থ সন্তানের জন্ম দিন। মাতৃত্বের স্বাদ নিন। মা-বাবা হন। সুসন্তান তৈরি করুন। দেশের ভবিষ্যৎ, সমাজের ভবিষ্যৎ, পরিবারের ভবিষ্যৎ— সব আপনাদের হাতে। □

# গরমে সুস্থ থাকার উপায়

**ডাঃ কুমকুম সরকার**

এই তীব্র গরমে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছি। গরমে শরীরে অস্থিরতা তৈরি হয়, ঘামাচি বা অন্যান্য চর্মরোগ হয়, অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীরে জল কমে যায়, আবার বয়স্ক মানুষের শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যায়। শুষ্ক আর্দ্রের গরমের জায়গায় (বাঁকুড়া, বীরভুম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া) লু লেগে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু কম সংখ্যক হলেও আমাদের সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকতে হবে মারাত্মক হিট্-স্ট্রোক থেকে। এটি জীবননাশকও হতে পারে। তাই আমরা এই গরমে কী করে একটু ভালো থাকবো তা জানতে হবে। সর্বপ্রথমে যেটি করতে হবে— প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। ঘামের সঙ্গে যেহতু খনিজ লবণ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই মাঝে মাঝে লবন-চিনি দিয়ে শরবৎ বানিয়ে খেতে হবে।

আমরা যদি কৃত্রিম পানীয় না খেয়ে ডাব বা আখের রস খাই, তবে শরীর অনেকটাই সুস্থ থাকবে এবং শরীরে যে অস্থিরতা তৈরি হয় তাও কম হবে। জলীয় ফল— তরমুজ, ফুটি, বেলের শরবৎ খাদ্যতালিকায় যুক্ত করলে উপকার পাওয়া যাবে। দৈনন্দিন খাবারে তেল, মশলা, ঝাল কম দিয়ে হালকা খাবার খেলে পেট ভালো থাকবে। হিট্-স্ট্রোক এবং লু-র হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিছু পরিবর্তন করা জরুরি। যেমন, সকালে একটু বেশি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে দৈনন্দিন কাজ করে নিয়ে দুপুরে ঘরের ভেতরে থাকা বাঞ্ছনীয়। সকাল সকাল বাজার করে, রান্না করে নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে নিন। তারপর কাজে বেরোনোর আগে সানস্ক্রিন লাগিয়ে, ছাতা ও রোদ চশমা পরে বেরোন। অবশ্যই হালকা সুতির জামাকাপড় পরবেন। যেখানেই যাবেন সঙ্গে জল নিতে ভুলবেন না। যেখানে কাজে যাচ্ছেন, যদি কাজ শেষও হয়ে যায়, তবুও বিকেল চারটের পর বেরোনো ভালো। সর্বশেষে বলি গরমে চর্মরোগের কথা। অতিরিক্ত গরমে ঘামাচি তো খুবই সাধারণ। তাছাড়া বিভিন্ন রকম ছত্রাকজনিত রোগ, লোমফোঁড়াও অনেক কষ্ট দেয়। তাই আমাদের একটু সচেতন থাকতে হবে। বারে বারে শুধু জল দিয়ে মুখ ধুতে হবে এবং অন্তত দুবার, প্রয়োজনে তিন-চারবার স্নান করে নিতে হবে। প্রত্যেকবারে চুল ভিজিয়ে স্নান করার দরকার নেই, দরকার শরীর থেকে ঘাম ধুয়ে ফেলা। একটু ঢিলে জামাকাপড় পড়া ভালো এবং দিনে অন্তত তিনবার জামা বদলানো দরকার বিশেষ করে যাদের চর্মরোগের প্রবণতা আছে। স্নানের জলে কোনো অ্যান্টিসেপটিক মিশিয়ে স্নান না করাই ভালো।

গরমের বিপরীত হলো ঠাণ্ডা, তেমনি গরম থেকে বাঁচার উপায় হলো ঠাণ্ডা প্রদানকারী জল। সেই জলকে বুদ্ধি সহযোগে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন জলের অপচয় যেন না হয়। □

## দেশের উন্নয়নের পথে বাধা মাওবাদ

# অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট একটি সঠিক পদক্ষেপ

অরিন্দম ভট্টাচার্য্য

সরকার ছিল। সামরিক বাহিনীও ছিল। ছিল না উন্নয়ন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়েও ছিল না প্রান্তিক, গরিব জনজাতির প্রতি দায়বদ্ধতা। ক্ষমতায় ছিল এক পরিবারবাদী সরকার। অন্য দেশের প্রতিপালনে আমদানি নির্ভর হয়ে ৫ শতাংশ মানুষের উন্নতি এবং ৯৫ শতাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অবনতির সরকার। আর ৪০ শতাংশ প্রান্তিক জনজাতি সমাজের মানুষেরা বুঝতেই পারতো না স্বাধীনতার অর্থ। কারণ একটি পরিবারের হাতে ছিল দল ও দেশ। বিদেশিদের ইজারা নিয়ে তারা সরকার চালাচ্ছিল। ভারতবাসীর প্রতি বাড়ছিল বঞ্চনা। শয়তান বিদেশি শক্তির দরকার ভারতজুড়ে আরও ধ্বংস, আরও নৈরাজ্য। আরও লুঠ ভারত ও তার মানুষের। তার জন্য অনেক নতুন দেশবিরোধী শক্তির প্রয়োজন।

লখিন্দরের লোহার বাসর ঘরে যেমন সিঁধ কেটে তৈরি হয়েছিল মরণপথ, নকশালবাড়িতে তেমনই জন্ম নিল মাওবাদী আন্দোলন। শিক্ষিত, জাতীয়তাবাদী মানুষের প্রত্যাখ্যান এবং কঠিন সরকারি শাসনের দৌলতে পশ্চিমবঙ্গে তারা ব্যর্থ হলো ১০ বছরেই। এরপর আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গিয়ে তারা নতুন পন্থা নিল। জঙ্গলকে ঘাঁটি করে দানা বাঁধতে থাকল মাওবাদী সন্ত্রাস। উন্নয়নের বৃত্তের বাইরে থাকা, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের ৪০ শতাংশ হলো জঙ্গলের গরিব, জনজাতি মানুষ। তাদের টার্গেট করল তারা। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু হলো এই পর্ব। বিদেশ প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র ও কোটি কোটি ডলারের সাহায্যে আগুনে মসিহা হয়ে তারা সমান্তরাল প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করল চার রাজ্য জুড়ে। তারাই সেখানে স্থানীয় সরকার। প্রচার করল যে, ভারত একটি অত্যাচারী দেশ। মার্ক্স-লেনিন-স্তালিন-মাও নাকি তাদের আদর্শ! বন্দুকের নল হলো ক্ষমতার উৎস! বিদেশি মদত ও তোলাবাজির টাকায় ছেঁড়া রুটি দেওয়ার মতো করে অল্প অল্প খাবার দিতে লাগল দেশের সরকারি সাহায্য না পাওয়া জনজাতিদের।

মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র জুড়ে ছড়াতে থাকল রেড করিডোর। মাওবাদী নৈরাজ্যবাদের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি থাকল নির্বিকার। চলতে লাগল অবাধে রুটি ছিঁড়ে দেওয়ার প্রতিদানে জনজাতিদের সম্পদ লুঠ, জঙ্গল ধ্বংস, জনজাতি মহিলা ধর্ষণ। যেমন লোভী, সরকারি প্রশাসক, তেমনি মাওবাদীরা। বিরসা মুণ্ডা থেকে সিধো কানুর ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মানুষদের তারা করে তুললো দেশবিরোধী, ভারত বিরোধী। ক্রমাগত হতে লাগল মাইন বিস্ফোরণ। চলল গ্রেনেড, বন্দুক, গুলির যথেচ্ছ ব্যবহার; সরকারি সম্পত্তি লুঠ, ব্রিজ, রাস্তা ভেঙে দেওয়া। সাধারণ মানুষ, সেনা, পুলিশ, বনরক্ষী, সরকারি আধিকারিক, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর হত্যা, অপহরণ। ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯০০০ ভারতীয় সেনা, পুলিশ ও সাধারণ মানুষকে ৪০০টি জেলায় হত্যা করা হয়। ধানবাদ, গয়া, লাতেহার, বিজাপুর, বস্তার, দান্তেওয়াড়া, গোন্ডিয়া, গড়চিরোলি, শ্রীকাকুলাম, চন্দ্রপুর জুড়ে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইদের লড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাণ্ডব, হত্যালীলা, রক্তস্নান চলতে থাকলো।

> "ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে গুলাগ, গ্রেট পার্জ, দ্য গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড বা কালচারাল রেভোলিউশন চলবে না। এগুলি ছিল রাশিয়া ও চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিরুদ্ধ মত পোষণের জন্য হত্যা।"

১৯৮০ সাল থেকে শুরু হয় পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ বা পিডব্লুজি, আর তার পরে এমসিসি (মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার)— এই দুই নৈরাজ্যের সশস্ত্র ধারা। এলাকা ভাগ করে নিয়ে হত্যা, লুঠ, চোরাপাচার আর সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধ্বংস। পিডব্লুজি কাজ করত মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে, আর এমসিসি বিহারে। এমসিসি মূলত জেহানাবাদ ও গয়ায় ভূমিহার ও জমির মালিকদের হত্যা, অপহরণ থেকে জমি, খনি, কয়লার জগতে শাসন কায়েম করল আর পিডব্লুজি জঙ্গল থেকে শুরু করে ব্রিজ সমেত নানা সরকারি পরিকাঠামো একেবারে হাওয়া করে দিল। তারা রক্ষক-ভক্ষক দুই-ই হয়ে উঠল জনজাতিদের কাছে। ভারতের মধ্যে সৃষ্টি হলো ২৫০০ কিলোমিটারের এক রেড করিডোর। খাবার, ওষুধ,

চিকিৎসা পরিষেবা, টাকা সবই দিতে লাগল মাওবাদীরা। এর বদলে তারা করত শোষণ, অত্যাচার, যৌন নির্যাতন, ছেলে-মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে আসা। অরণ্যাঞ্চলগুলিতে স্কুল-কলেজ উড়িয়ে দিয়ে শুরু হয় মাওবাদের উপাসনা। কেউ সামান্যতম সরকারি সুবিধা নিলে, প্রশাসনিক দপ্তরে গেলে জন-আদালতে চলে বিচারের প্রহসন ও হত্যা। সরকারি কর্মীরাও রেহাই পেতেন না। দেশের মধ্যে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাওবাদীরা এক আদিম, অসভ্য সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলল। ৯ জন এমএলএ এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে তারা হত্যা করে। মাওবাদী হানায় প্রায় ১০,০০০ আধাসেনা, পুলিশ, সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, বনরক্ষী, সরকারি কর্মীর প্রাণ যায়। ভারতে ঘটে ৩৭টি বিস্ফোরণ, ১৪টি বিরাট মাপের গণহত্যা। ১৭টি জঙ্গলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ হয় নিষিদ্ধ। রণবীর সেনা, সালোয়া জুডুম করে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ প্রতিরোধের চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই লাভ হলো না। বিদেশি আর্থিক মদত, আইএসআই-এর তৈরি ছক, চীনা অস্ত্র, বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে প্রবাহিত অর্থের স্রোতের দরুন ভারতকে ঘিরে এলটিটিই, খালিস্তানি, মাওবাদী, জেহাদি, দাউদ ইব্রাহিম, পেট্রোডলারের এক বর্বর সাম্রাজ্য কায়েম হলো।

প্রথম পরিবর্তন আনলেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড তৈরি করলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু তাঁর প্রশাসনকে গতিশীল ও আধুনিক করলেন। মহারাষ্ট্র-নাগপুর অঞ্চলের উন্নয়নে জোর দিল শিবসেনা-বিজেপি সরকার। পুলিশ ও আধাসেনার আধুনিকীকরণ শুরু হলো। এলটিটিই, খালিস্তানি মুছে গেল। কার্গিলের যুদ্ধের পর আইএসআই-পাকিস্তান দুর্বল হলো। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। দেশজুড়ে স্বয়ংসেবকরা আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রকল্প চালাতে লাগল। এই সাঁড়াশি চাপে এমসিসি প্রায় মুছে গেল। পিডব্লুজি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল গড়চিরোলি, দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ, বস্তার-বিজাপুর, লাতেহার জেলায়। ৩০০০ কিলোমিটার সাম্রাজ্য নেমে এল ১০০০ কিলোমিটারে। ৪৩৭টি জেলা থেকে ২২০টি জেলায় সংকুচিত হলো মাওবাদ। বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন, সংরক্ষণ, স্কুল-কলেজ (শিক্ষা), রোজগার, সরকারি চাকরির স্বাদ পেল ৫০ বছর ধরে স্বাধীন দেশের পরাধীন মানুষরা। সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পে নির্মিত জাতীয় সড়কগুলি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করল বহুগুণ। পুলিশ ও আধাসেনার পক্ষে সহজতর হলো যাতায়াত। সরকারি সুবিধা, বিভিন্ন যোজনা ছুঁয়ে ফেলল প্রান্তিক মানুষদের। জনজাতিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল মাওবাদী বর্বরদের বিরুদ্ধে। ধরিয়ে দিতে লাগল তাদের। ঠিক সে সময়ে ছন্দপতন ঘটল। ২০০৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তিত হলো।

আধাসেনা ও পুলিশের আধুনিকীকরণ বন্ধ হলো। সেই সুযোগে পিডব্লুজি আর এমসিসি মিলে তৈরি হলো সিপিআই (মাওবাদী)। তারা ফের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করল। তৈরি করতে লাগল রাষ্ট্রবিরোধী, বামমনস্ক কিছু তথাকথিত খ্যাতনামা সাংবাদিক, লেখক, গায়ক, কবি, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, অধ্যাপক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, বিভিন্ন এনজিও, নাট্যকর্মী, তথাকথিত মানবাধিকার কর্মী নিয়ে এক সুচতুর গোষ্ঠী, যাদের পরিচয় হলো— 'আরবান নকশাল'। যারা মাওবাদীদের কার্যকলাপকে মহান বলবে। পুলিশ, আধাসেনা ও দেশের সরকারকে অত্যাচারী বলবে। নকশালদের মহান হিসেবে দেখিয়ে নাটক, গল্প, উপন্যাস লেখা হবে, সিনেমা তৈরি হবে। তার ভিত্তিতে জনমত তৈরি করবে সাংবাদিকরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ করবে মানবাধিকার কর্মীরা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মগজ ধোলাই করবে সেই শিক্ষকরা। বিদেশ থেকে সমস্ত টাকা আসবে জেহাদি, বাম ও অতিবামমনস্ক বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে। এর ফলে শহুরে (আরবান) ও জঙ্গলে— দুই প্রকারের মাওবাদী ফুলেফেঁপে উঠল। বাম-জেহাদি জোট তৈরি হলো। সরকার থাকল নির্বিকার ও মৌন। ফের শুরু হলো গণহত্যা, সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ, সরকারি পরিকাঠামো ধ্বংস এবং একইসঙ্গে জনমত তৈরি যে এটা ভুল নয়। তথাকথিত আইনজীবীরা দেশের ভিতরের শত্রুদের সাহায্য করতে শুরু করল। পরপর আক্রমণে প্রাণ দিতে থাকল আধাসেনা, পুলিশ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাকেও হত্যা করল তারা। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের হাত দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল নব্য মাওবাদ। জঙ্গলমহলে শুরু হলো খুন, হত্যা, বিস্ফোরণ। জঙ্গলমহলে সক্রিয় মাওবাদীদের সাহায্যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, টাকা-খাওয়া আরবান নকশালরা ছিল সদা-তৎপর। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও একবার হত্যার চেষ্টা করে তারা। এক ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয় গোটা রাজ্যে। মাও-মার্ক্স দ্বন্দ্বে সে যাত্রায় পরাজিত হয় বঙ্গীয় বামপন্থীরা। ২০১১ সালে রাজ্যে ঘটে পট পরিবর্তন।

সালটা ২০১২-১৩। প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ নিজেই টাইগার টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান। এই টাস্ক ফোর্সের উদ্দেশ্য ব্যাঘ্র সংরক্ষণ, বাঘের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি। সেই সময় গড়চিরোলি ও গোন্ডিয়ায় নির্মিত হয় মাওবাদী নৃশংসতার এক বীভৎস ইতিহাস! মার্ক্সবাদ-মাওবাদের বস্তাপচা বুলি আউড়ে,

মাওবাদীদের খোঁজে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান।

জল-জমি-জঙ্গলের অধিকারের নামে নির্বিচারে ৩০০০ গরিব, জনজাতি সমাজের মানুষকে তারা হত্যা করে; তার সঙ্গে ১৫০ জন পুলিশ এবং ফরেস্ট গার্ড, আধাসামরিক বাহিনী, শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী নিয়ে প্রায় ১০০০ জনকে হত্যা করে মাওবাদীরা। টাডোবা-অন্ধেরি, নাগজিরা, মেলঘাট জুড়ে চলে অরণ্য ধ্বংস। বাঘ হত্যা, চিতাবাঘ হত্যা, বন্যপ্রাণী চোরাচালান, গাছকাটা, গাছ বেচে দিয়ে চলে কোটি কোটি টাকা কামাই। বাধা দেওয়া চলতে থাকে ব্যাঘ্রশুমারিতে। কারণ বাঘের সংখ্যা গুনতে গেলে বাঘের সঙ্গে 'মাওবাদী' নামক জানোয়ারগুলো ধরা পড়ে যাবে। আর গোন্ড, মাড়িয়া, পরধান— সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্থানীয় জনজাতির উপর অত্যাচার তো কহতব্য নয়। অরণ্য রক্ষা করতে, দেশ বাঁচাতে কোনো সরকারের হাতে অর্থের অভাব ছিল না। ছিল আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ। শুধু ছিল না সদিচ্ছা ও সাহস। মানসিকতা ছিল না ফান্ডিং বন্ধ করে আরবান নকশালদের সজোরে প্রত্যাঘাত। ছিল না তাদের জেলে ভরার প্রয়াস। ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশবিরোধী হওয়া থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। জানোয়ারগুলো বিরোধিতা করত জনজাতি সমাজের উন্নয়নে, বাধা দিত পরিকাঠামো উন্নয়নে। রাস্তা ভেঙে দেওয়া, কন্ট্রাক্টরদের হত্যা, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া, নির্বিচারে বন্যপ্রাণী পাচার, জন-আদালত বসিয়ে গরিব মানুষকে হত্যা ছিল তাদের কাজ। চক্রব্যূহ বানিয়ে এদের সাপোর্ট দিত মুম্বইয়ের বলিউড এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এদের হয়ে লেখালেখি করা আরবান নকশালরা।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার বদল হলো। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে হয়েছে তেলেঙ্গানা। স্থানীয় প্রশাসন, রাজ্য প্রশাসন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক— তিনটি স্তর একত্রে কাজ করা শুরু করল। প্রবল আধুনিকীকরণ হলো আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফের। মাওবাদীদের ঠেকাতে আলাদা প্রশিক্ষিত বাহিনী তৈরি হলো। নামলো নাগা ব্যাটেলিয়ন, গ্রেহাউন্ড ও কোবরা বাহিনী। সঙ্গে বাস্তবায়িত হলো রিলোকেশন ফরেস্ট প্ল্যান। বনের মধ্যে থাকা প্রচুর গ্রাম ও জনজাতি গ্রামের পুনর্বাসন হলো। জঙ্গল থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে জনবসতি স্থাপন করে প্রত্যেককে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হলো। পরিবার পিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া হলো। দেওয়া হলো পরিবারপিছু একটি সরকারি চাকরি। এরসঙ্গে পুরো অরণ্য জুড়ে চলল তীব্র অপারেশন। উন্নয়ন আর প্রত্যাঘাত এবার হলো একসঙ্গে। ২৬০০ মাওবাদী নিকেশ হলো। প্রায় ৫ হাজার পালিয়ে বাঁচলো। কিছু আত্মসমর্পণ করল। সবচেয়ে বেশি সাহায্য করল গোন্ড, মাড়িয়ারা— খবর সরবরাহ করে। ওরা বুঝতে পারে যে কারা ওদের ৫৫ বছর শোষণ করেছে। চারু থেকে গণপতি— চলছিল এক শোষণ ও

উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র দেখছেন নিরাপত্তা আধিকারিকরা

১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের প্রায় ২ লক্ষ সেনা ও সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে পাকিস্তান। মাওবাদীরা হত্যা করেছে ১৫৩৩৫ জনকে। এরা ভারতের ভেতরের পাকিস্তানি। মাওবাদী ডেরা থেকে উদ্ধার হওয়া ড্রোন, মেশিনগান সম্প্রতি লোকসমক্ষে প্রদর্শন করেছে ছত্তিশগড় পুলিশ। সেখানে ৭০০ কোটি টাকার পাকিস্তানি আইএসআই ও চীনা সরঞ্জাম জনসমক্ষে আনে পুলিশ। এই অর্থে তো ১০০টি জনজাতি গ্রামকে ৫ বছর ধরে তারা খাদ্য সরবরাহ করতে পারত। কিন্তু করবে না, কারণ ওরা বিদেশি এজেন্ট। উন্নত ভারতের পক্ষে ওরা নয়।

লুণ্ঠতন্ত্র। জনজাতিরা এবার বিশ্বাস রাখলো সরকারের উপর। তারা বুঝতে পারলো যে উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ এই সরকার। এল আইন। এনজিওগুলির টাকার হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক হলো। কোন টাকা কোন কারণে আসছে তা সরকারকে জানাতে হবে। বাম-জেহাদি যোগসাজশ নিয়ন্ত্রিত হলো। টুকরে টুকরে গ্যাং ও আজাদি ব্রিগেডকে জেলে ঢোকানো শুরু হলো। আরবান নকশালরা পুলিশি জেরার মুখে পড়ল।

পাঁচ বছরে সাফ হয়ে গেল গড়চিরোলি, গোন্ডিয়া, চন্দ্রপুর, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ। টাডোবা অরণ্যে আজ বহু দেশি বিদেশি পর্যটক আসেন। পর্যটনক্ষেত্রে মানুষের রোজগার ও সরকারের রাজস্ব ২০১৪-র আগে যা ছিল, ২০২৪-এ তা বেড়েছে বহুগুণ। বাঘের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। বনজ সম্পদ মধু, মোম, মাটি, জলকে ব্যবহার করে সেই রিলোকেটেড জনজাতিরা খুলেছে বনজ হাট। তাঁদের অনেকেই আজ ফরেস্ট সাফারির গাড়িচালক, গাইড, ফরেস্ট গার্ড, রেঞ্জার্স অফিসের করণিক, পিওন।

মাওবাদী দমনের লক্ষ্যে শেষ আঘাত শুরু হলো কোভিডের পর। ৪০০ থেকে ২০৯ জেলা হয়ে মাওবাদীদের উপস্থিতি নেমে এলো ৭০টি জেলায়। বিজাপুর, বস্তার, দান্তেওয়াড়ায় শুরু হলো 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'। মাওবাদী খতমের ডেডলাইন ধার্য হলো ৩১ মার্চ, ২০২৬। স্যাটেলাইট ম্যাপিং ও ড্রোনের সাহায্যে সিআরপিএফ, কোবরা যৌথ বাহিনীর কুমবিং অপারেশন। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী আর স্থানীয়রা দিচ্ছে খবর। কোথায় রয়েছে মাওবাদীদের গোপন ঘাঁটি, কোথায় তারা লুকিয়ে থাকে— স্থানীয়রা দিতে থাকে তার সুলুকসন্ধান। বহু দিন পর তারা পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। তাদের জীবন হয়ে উঠেছে সুস্থ ও স্বাভাবিক। 'সবকা বিকাশ'-এর শরিক তারাও হতে চায়।

জঙ্গলের প্রাণীরা সুন্দর। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কিছু কাগুজে দানব ঢুকে আছে। চীনের চেয়ারম্যান এদের চেয়ারম্যান! উপাচার্য, শিক্ষক, পুলিশ মেরে এরা কিন্তু চীনে আশ্রয় নেয় না। তারা কিউবাও যায় না। যায় আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। বাম-অতিবামেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়তে, চাকরি করতে চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা পাঠায় না। পাঠায় পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী দেশ— আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ইংল্যান্ডে। এরাই হলো আরবান নকশাল। এদের মোকাবিলা খুবই জরুরি।

রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও আধাসেনাদের কনভয়ে তারা মাইন বিস্ফোরণ ঘটাবে। স্টিল ফ্যাক্টরি বন্ধ করবে। অরণ্যাঞ্চলে তোলাবাজি চালাবে। পশ্চিমবঙ্গের শালবনী, শিলদা, লালগড়, বেলপাহাড়ি অঞ্চলের উন্নয়ন আটকাতে সেখানে চলবে তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। সেখানে যাবে কলকাতা থেকে আরবান নকশাল দাদা-দিদিরা স্করপিও-ইনোভা করে। ২০০৯ সালে সিপিএম ক্যাডার শালকু সোরেনকে হত্যা করে মাওবাদীরা। তার মা এখনও বেঁচে। ইতিহাসের কী পরিহাস! তার হত্যাকারীদের মৃত্যুতে তার পার্টিই আজ শোকে মুহ্যমান! ছত্তিশগড়ের তিনটি অভয়ারণ্য জনসাধারণের জন্য বন্ধ ৯ বছর। ইন্দ্রাবতী, উদন্তি ও অচানকমার। বাঘ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা কমছে। সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হচ্ছে বন্যপ্রাণ। ২০২৪ সালে ছত্তিশগড়ে রাজ্য সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। বিজাপুর, বস্তার, দান্তেওয়াড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে শুরু হয়েছে 'অপারেশন সংকল্প'।

এরা চেনা সন্ত্রাসবাদী। এরাই ডেপুট করে অচেনা অথচ খ্যাতনামা আরবানদের। মুখোশের আড়ালে থাকে এই আরবান নকশালরা। আমির খান, মেধা পাটেকর চলে যান সর্দার সরোবর আটকাতে। এমনকী মাঝে মধ্যেই এরা পৌঁছে যায় তুরস্ক। এসব কাণ্ড করার সময় এই দেশে তাদের দমবন্ধ হয়ে যায় না। মেধা পাটেকর, অনুরাধা তলোয়ার পৌঁছে যান ভারতের বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি উন্নয়নযজ্ঞ আটকাতে। জেহাদি-মাওবাদী জোট হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। লাদেনকে তৈরি করার দাম আমেরিকাকে ৯/১১ দিয়ে মেটাতে হয়েছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রণম্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ৫ বছরে রুণু গুহ নিয়োগীর ট্যাবলেট দিয়ে চারু মজুমদার গ্যাংকে বিনাশ করেছেন এবং পঞ্জাবের রাজ্যপাল থাকাকালীন কেপিএস গিলকে দিয়ে খালিস্তানি সমস্যার সমাধান করেছেন। প্রশাসন বা সিস্টেমের ভিতরে এই শহুরে নকশালরা অকল্পনীয় ক্ষমতাবান। তিস্তা সেতলওয়াড়ের জন্য কোর্ট খুলে যায় রাত সাড়ে দশটায়। এদিকে রাজ্যের ডিএ মামলা দশ বছর ধরে চলে। টাটা, মিৎসুবিসি, জিন্দাল, আম্বানি-আদানি সব এদের শত্রু। শিল্প স্থাপন, পরিকাঠামো উন্নয়ন হলেই এদের গাত্রদাহ! জনজাতির জল-জমি-জঙ্গলের অধিকারের স্লোগান তুলে তুমুল নৈরাজ্য কায়েম করা এদের লক্ষ্য।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মগজ ধোলাইয়ে এই আরবান নকশাল ব্রিগেড সিদ্ধহস্ত। ছাত্রাবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মাথায় ঢোকানো হয়— 'কীসের ভারত?', 'জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম হলো বুজরুকি' ইত্যাদি। এদের কার্যকলাপ ও গতিবিধি বুঝতে হলে দুটি সিনেমা অবশ্যই দেখতে হবে— 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' ও 'বস্তার'। বুঝতে পারবে তিস্তা, জুবের, মেধা এবং গণপতি, বাসবরাজ, কিষেণজী, চীন, আইএসআই— সব এক শৃঙ্খলে যুক্ত। একই জায়গা থেকে অস্ত্র ও আর্থিক মদত পায় মুর্শিদাবাদ, পহেলগাঁওয়ের জেহাদি থেকে দান্তেওয়াড়ার মাওবাদী। একটাই দানব বন্ধন। ২০১৬ সালে বিবেক অগ্নিহোত্রী নির্মিত 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম'-সিনেমাটি দেখতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহু দর্শক এই আরবান নকশালদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিবেক অগ্নিহোত্রীকেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘেরাও করে দেওয়া হয়। এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই ১৯৭০ সালে তদানীন্তন উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করে মাওবাদীরা। ২০২৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ র‍্যাগিং চালিয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে হত্যা করে এই আরবান নকশালরা। স্তালিন-মাও-পল পট কি কোনোদিন গণতন্ত্র বা মানবিকতার আদর্শ মানতেন? ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে গুলাগ, গ্রেট পার্জ, দ্য গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড বা কালচারাল রেভোলিউশন চলবে না। এগুলি ছিল রাশিয়া ও চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিরুদ্ধ মত পোষণের জন্য হত্যা। স্তালিন ও মাওয়ের শিষ্যরা তাদের হিসেব অনুযায়ী ঠিক রাস্তায় চললেও ঠিক দেশে তারা নেই।

ভারত সরকার সকল নাগরিকের জন্য সেনা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করুক। প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে ২৫ বছর বয়সের আগে ২টো বছর সেনাবাহিনীকে দিতে হবে। তাঁরা সমরকৌশল, প্রতিরোধের কায়দা কানুন শুধু নয়, পাবে দেশভক্তির পাঠ। দেশকে 'মা' হিসেবে চিনতে শিখবে।

ভারতের বুক থেকে জেহাদ, মাওবাদ শেষ করার বিরাট ধাপ হলো— 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'। ভারত যে পল পটের দেশ হবে না, এখানে যে গাজওয়াতুল হিন্দ হবে না, সেই দেওয়াল লিখন আজ স্পষ্ট। আগামীদিনে এক নতুন প্রভাতের নাম— 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'। ■

# গদখালিতে ভারতমাতা ও কন্যাপূজার অনুষ্ঠান

গত ১৭ মে দক্ষিণ পরগনা জেলার বাসন্তী খণ্ডের গদখালি গ্রামের যুবকদের উদ্যোগে ভারতমাতাপূজার আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে গ্রামের পাঁচশতাধিক পুরুষ-মহিলা শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গাবারি আনয়ন করেন। তা দিয়ে ভারতমাতার পূজা ও অভিষেক সম্পন্ন হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকেও বহু মানুষ পূজায় অংশগ্রহণ করেন। পূজার পর সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এদিকে পূজার তত্ত্বাবধানে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রমুখ দুলাল নস্কর। ১৮ মে একই মঞ্চে কন্যাপূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লক্ষ্য ছিল ১০৮ কন্যাপূজা করা হবে। কিন্তু গ্রামবাসীদের উৎসাহে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৪ জন। তার আগে বিকেল তিনটে থেকে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৩ হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত মাঠে কন্যাপূজন শুরু হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ১১৪ জন কন্যার হাতে রঙিন শাড়ি, সাজ সজ্জার উপকরণ, ১ প্যাকেট মিষ্টি এবং গলায় রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও ১১৪টি শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর প্রত্যেক কন্যার মা তাঁদের নিজ নিজ কন্যাকে পূজা করেন। আগত মা-বোনেরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি-সহ অনুষ্ঠানস্থল প্রদক্ষিণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ কন্যাপূজনের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহ সুকুমার নস্কর, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত গ্রামবিকাশ প্রমুখ দুলাল নস্কর, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদস্য অলোকেন্দু অধিকারী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত কার্যকর্তা বিকর্ণ নস্কর এবং সনাতন সংস্কৃতি সংসদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি শিবশঙ্কর মজুমদার। অনুষ্ঠান শেষে ২৮টি গ্রাম থেকে আগত ১১৪ জন কন্যা এবং তাদের মা-বাবার সঙ্গে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পরিচয় পর্ব সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

# তুহিনা প্রকাশনীর পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান 'স্ব-ভাবে রামকিঙ্কর'

রামকিঙ্কর এক বিস্ময়। তাঁর শিল্পকর্ম, তাঁর জীবনযাপন নিয়ে শিল্পীমহল এবং সংস্কৃতিবান মানুষের খুবই কৌতূহল। তাই তাঁর শতবর্ষে ডঃ অনিন্দ্যকান্তি বিশ্বাসের গবেষণা লব্ধ তথ্যে রচিত 'স্ব-ভাবে রামকিঙ্কর' পুস্তকের প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো গত ২৫ মে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বিনয় সোরেন, অধ্যাপক ও ভাস্কর্য অসিত দাশগুপ্ত, কলাভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শিশির সাহানা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, অধ্যাপিকা কল্কিকা মুখার্জি এবং তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার হিমাংশু মাইতি। দর্শক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কন্যা বুলবুল বসুর সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এরপর রয়াল সাইজের অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবির সমাবেশে সুদৃশ্য প্রচ্ছদের পুস্তকটির উন্মোচন করা হয়। এছাড়াও 'দশটি কিশোর গল্প' এবং 'চাইল্ড স্পেশালিস্ট এবং আপনি' বইদুটির প্রকাশ করা হয়। শিল্পী অনিন্দ্যকান্তি বিশ্বাস রামকিঙ্কর বেজের জীবনের নানান ঘটনা এবং তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে অনেক অজানা তথ্যের ওপরে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান এবং রবীন্দ্র কবিতা পরিবেশিত হয়। জাতীয় সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিলন দে।

ফ ঃ ৪

# বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ১৪০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে গত ২৫ মে মধ্য কলকাতায় মহাজাতি সদনে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ১৪০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যরা বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্র অভিজিৎ রায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বিশ্বাস বাগচী, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, সমিতির সহ-সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ভাইঝি ইন্দ্রাণী বসু ও দুই নাতি পার্থসারথি বসু, রজনীকান্ত বসু, 'রাসবিহারী বোস রিসার্চ ব্যুরো'র সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর নাতি ইন্দ্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতবৌ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্মারক সমিতির সম্পাদক সুবীর সাহা, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তের ভাইপো পরিমল সেনগুপ্ত ও অন্যান্য বিশিষ্টজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্দামান সেলুলার জেলে ১৪ বছর কাটানো বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর নাতনি কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য কৌশিক বিশ্বাস, সুদীপ বিশ্বাস, সায়ন্তন বিশ্বাস, সুতপা বিশ্বাস, কল্পনা বিশ্বাস ও এমিলি বিশ্বাস, অধ্যাপক ও সমাজসেবী দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়াও আরও অনেকেই মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন অনিমা সরকার, ডলি ঘোষ, সাধনা গোলদার, রাজদীপ্তি মিত্র, চন্দ্রাণী কর্মকার ও রীনা দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সহ-সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস।

# জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানে অন্নপূর্ণাপূজা

উজ্জয়িনী ফাউন্ডেশন জলপাইগুড়ির সহযোগিতায় এবং সেবা ট্রাস্ট জলপাইগুড়ির ব্যবস্থাপনায় গত ২০ মে জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানের জগৎপুর জনজাতি পাড়ায় অন্নপূর্ণাপূজার আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ি রেসকোর্সপাড়া নিবাসী বিপ্র চক্রবর্তী তাঁর বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করেন। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার প্রবীণ নাগরিক কিরণশঙ্কর ঘোষ, ভূপতি গ্রামের শুভঙ্কর রায়, জনজাতি সমাজের পক্ষে মাতৃশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী পাউরি মুণ্ডা, অজিত নাগাসিয়া, সঞ্জু মুণ্ডা, সেলিম ওরাওঁ, আরোগ্য ভারতীর কেশব বিশ্বাস, সক্ষমের পক্ষে রাজেশ আগরওয়াল, কৃষি বিজ্ঞানী সুবীর রায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রহেলিকা আচার্য, জলপাইগুড়ি সেবা ট্রাস্টের পক্ষে চন্দন রায়, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শুভ্রজিৎ রায়। অনুষ্ঠানে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে খাতা-কলম তুলে দেওয়া হয়। শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

# শিলিগুড়িতে সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে নারদজয়ন্তী উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হলো নারদজয়ন্তী অনুষ্ঠান। গত ১৮ মে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কেন্দ্র শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডস্থিত টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেক্ষাগৃহে নারদজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৪৬ জন সাংবাদিক বন্ধুকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সরূপ প্রসাদ ঘোষ। বর্তমান বিমর্শের লড়াইয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের ভূমিকার বিষয়ে তিনি বিশেষ আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজি এই চার ভাষার চারজন সিনিয়র সাংবাদিককে 'দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়।

শিলিগুড়ির পাশাপাশি এদিন উত্তরবঙ্গের ১০টি সাংগঠনিক জেলার— মালদা শহর, চাঁচল, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডি, ঈশ্বরপুর, নকশালবাড়ি, জলপাইগুড়ি শহর, মাল, ধুপগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও কালিম্পঙে নারদজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়।

# বীরভূমের লাভপুরে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ২৫ মে লাভপুরে তিনজন প্রবীণ নাগরিককে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কবি-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভিটের ঠিক উলটো দিকের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঠাকুরদালানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমজন ৯০ বছরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিপ্রসাদ সরকার, দ্বিতীয়জন ৯১ বছরের ফুটবল খেলোয়াড় ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয়জন পূর্বোক্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন শ্রদ্ধার সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ডাক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনজনকে মাল্যদানে ভূষিত করেন লক্ষ্মণ বিষ্ণু এবং কল্পনা বিষ্ণু। পূজা করেন বউমা অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কন্যা সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায় এবং সুজাতা বিষ্ণু। শ্রদ্ধার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তিনজনের হাতে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন সংস্থার অনুভবী রুপালি ঘোষাল, সম্পাদক দামোদর ঘোষাল, ইন্দ্রজিৎ দাস, কৃষ্ণেন্দু ঠাকুর ও রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরীয় পরিয়ে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সংস্থার প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করেন শিক্ষক শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন অর্যমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা দত্ত। তবলায় সঙ্গত করেন সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষে কৃতজ্ঞতা জানান সংস্থার সহ সম্পাদক জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে বিপ্লবী বীর বিনায়ক সাভারকরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ২৮ মে মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট-স্থিত মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী, কবি, সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রবাদী চিন্তানায়ক স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১৪৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী, দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকার সাংবাদিক রক্তিম দাশ, স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের জীবন ও তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক গবেষক মলয় পাতলা ও সুদীপ দাশ। সভায় তাঁর বক্তব্যে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের অবদানের বিষয়টি বিশদে তুলে ধরেন অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শ পুরুষ হিসেবে বীর সাভারকরের স্থান পাওয়া উচিত বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। বীর সাভারকরের অবদান দেশবাসী স্মরণ করেনি, তাঁর অবদান ভুলে গিয়েছে, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর প্রদর্শিত পথে ভারত অগ্রসর হয়নি এবং তার পরিণামে দেশ বিভাজিত হয়েছে, অগণিত হিন্দু হয়েছে উদ্বাস্তু— এই বিষয়গুলি উঠে আসে সাংবাদিক রক্তিম দাশের বক্তব্যে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধহীন একটি জাতি বা সমাজ যে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে সে বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠে। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন, আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁর সুদীর্ঘ কারাবাস, জেলমুক্তির পর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকাণ্ডের বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করেন গবেষক মলয় পাতলা। বক্তাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তাঁর আবির্ভাবের মুহূর্ত হতে জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত তিনি ছিলেন রণক্লান্ত মহাবিদ্রোহী, দেশমাতৃকার স্বাধীনতা, অখণ্ডতা বিনা যাঁর শান্তি নেই। বিভিন্ন বিষয়ে পারঙ্গম, শস্ত্র চালনায় সুদক্ষ, রণকৌশলে তুখোড়, লক্ষ্যে দৃঢ়চেতা— এ সকল নিয়েই তিনি বিপ্লবী স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর। ভারত থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পর্যন্ত একদা ছিল তাঁর বিচরণক্ষেত্র। গড়ে তুলেছেন সশস্ত্র সংগঠন 'অভিনব ভারত'। তাঁর ব্যক্তিমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন তাবৎ বিপ্লবীকুল। কারামুক্তির পরেও যুক্ত থেকেছেন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে, হয়েছেন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনিই সুভাষচন্দ্রকে অর্পণ করেছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর হস্তে— বাকিটা খোদিত রয়েছে রক্তে, স্বেদে, অশ্রু, বেদনা ও আগ্নেয় প্রতিস্পর্ধায়। বহু মানুষের সমাগমে এদিন সভাগৃহটি ছিল পূর্ণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সন্দীপ মুখোপাধ্যায়।

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

# পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব

**সপ্তর্ষি ঘোষ**

উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গা তীরবর্তী এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ পাটিহাটি। কারও মতে, 'পুণ্যহট্ট' বা 'পণ্যহট্ট' নাম থেকেই 'পানিহাটি' কথাটি এসেছে। একদা গঙ্গা তীরবর্তী এই অঞ্চলে পণ্য আমদানি-রপ্তানি হতো বলেই 'পণ্যহট্ট' নামটি প্রচলিত ছিল। এই জনপদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

পুরী যাওয়ার পথে এবং পুরী থেকে গৌড় যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানিহাটি গঙ্গার ঘাটে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল পানিহাটি। গঙ্গার তীরে সেই আটটি 'শ্রীচৈতন্য ঘাট' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত,। শোনা যায়, ১১০২ বঙ্গাব্দে রাজা বল্লাল সেন এই ঘাট তৈরি করেছিলেন। ঘাটের ঠিক উপরেই আছে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ। কথিত আছে, এই বটবৃক্ষের নীচেই শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

পানিহাটিতে কয়েকদিন অবস্থান করার পরে নীলাচলে যাওয়ার আগে চৈতন্যদেব প্রভু নিত্যানন্দকে দক্ষিণবঙ্গে বৈষ্ণবমত প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিত্যানন্দ একদিন নৌকাযোগে গঙ্গাতীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে নামকীর্তন করতে করতে পানিহাটির 'শ্রীচৈতন্য ঘাট'-এ নামলেন। সেই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভক্তিপ্রাণ ভাইপো রঘুনাথ মজুমদার ওই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করার জন্য রঘুনাথ ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানান। সেই সঙ্গে রঘুনাথ সবিনয়ে বলেন, এত দেরি করে কৃপাপার্থী হতে এসেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দের কাছে এই স্বকৃত অপরাধের জন্য দণ্ড বা শাস্তি প্রার্থনা করেন। বিনয়ী রঘুনাথের মুখে একথা শুনে নিত্যানন্দ তাঁকে দু'হাত বাড়িয়ে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার মতো বিনয়ী বৈষ্ণবের বৈষ্ণব সেবাই দণ্ড। এখানে উপস্থিত বৈষ্ণবদের দই-চিড়ে দিয়ে মহোৎসব করাও। আমি তোমাকে এই দণ্ডই দিলাম।' সেই শুভদিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সেদিন নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ সানন্দে চিড়ে, দই, কলা, দুধ, চিনি প্রভৃতি সংগ্রহ করে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে ভোজন করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। এই উৎসবই বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে 'দণ্ড মহোৎসব' নামে পরিচিত। উৎসবান্তে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ।'

তদবধি রঘুনাথ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈষ্ণব ও ভক্তের সমন্বয়ে এই মহোৎসবের আয়োজন করতেন। রঘুনাথের পর পানিহাটি নিবাসী রাঘব পণ্ডিত দণ্ড মহোৎসবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আজও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটিতে এই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। দণ্ড মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ঢল নামে।

'শ্রীচৈতন্য ঘাট' এর উপর দণ্ড মহোৎসবের প্রাঙ্গণটি বাঁধানো। পাশে একটি ছোটো ঘরে চৈন্যদেবের চরণচিহ্ন পূজিত হয়। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, গৌর-নিতাই ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহও এখানে রক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ বহুবার দণ্ড মহোৎসব যোগদান করেছেন। পানিহাটি নিবাসী মণিমাধব সেনের কাছে তিনি প্রথম এই উৎসবের বিষয়ে জ্ঞাত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করতে পানিহাটিতে প্রথম আসেন ইংরেজি ১৮৬৮ সালে। ১৮৮৫ সালে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার এসেছিলেন পানিহাটির মহোৎসবে। এই উৎসবে উপস্থিত থেকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করতেন।

পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এক মহামিলন মেলা। লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণ মাতানো কীর্তনে মেতে ওঠে মহোৎসব প্রাঙ্গণ। বহু বিদেশি ভক্তও দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করে উৎসবের কৌলীন্য বৃদ্ধি করেন। এই বছর দণ্ড মহোৎসবের তারিখ পড়েছে ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ (৯ জুন ২০২৫) সোমবার। ▯

# হিন্দু দর্শন বেদভিত্তিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি

**বন্দনা বিশ্বাস**

হিন্দু দর্শন হলো ভারতীয় দর্শনের এমন একটি অন্যতম শাখা যা বেদকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করে। মূলত হিন্দুদর্শন আস্তিক ধারার একটি অংশ। যা ঈশ্বর ও আত্মাকে বিশ্বাস করে। হিন্দু দর্শন বিশ্বাস করে যে প্রতিটি জীবিত প্রাণীর একটি আত্মা আছে যা পরমাত্মার অংশ। আর হিন্দু দর্শন এটাও বিশ্বাস করে যে কর্ম অনুযায়ী এবং কর্মফল অনুযায়ী জন্ম জন্মান্তরের চক্রে জীবজগৎ এগিয়ে যায়।

হিন্দু দর্শন বৈদিক মত, ঋষিদের চিন্তাভাবনা, চর্চা, পুরাণকথা ও সমাজজীবনে সঙ্গে মেলবন্ধনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সৃষ্ট। হিন্দু দর্শনের উদ্ভব একটি দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ফল। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা কোনো একজন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বলা যায় এটা বহু শতাব্দী ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন জ্ঞানী, মুনি, ঋষিদের দ্বারা গড়ে উঠেছে। হিন্দু দর্শন দীর্ঘকাল ধরে এক বিস্তৃত ও গভীর চিন্তাধারা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মুনিঋষিদের অভিমত— হিন্দু দর্শন কোনো একটি মতবাদ নয় বরং এটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রত্যক্ষ সত্য।

হিন্দু দর্শন তার মৌলিক প্রকৃতিতে কেবল একটি বুদ্ধিভিত্তিক বা তত্ত্বগত অনুশীলন নয়। এটি একান্তভাবে অনুভব নির্ভর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তি হলো বেদ। এটি মূলত আত্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ 'আমি' কে? জগৎ কী? 'এই জগতের প্রকৃতি কী'? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা। এটি কোনো বাহ্যিক বিশ্বের বিষয় নয়। এটা পুরোপুরি অন্তর্জগতের জ্ঞান। এই অনুসন্ধানের প্রেরণা আসে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।

হিন্দু দর্শনের সূচনা মূলত ঋকবেদের যুগ থেকে। এই সময় দর্শন ও ধর্ম এক সূত্রে গাঁথা ছিল। যেমন যাগ-জজ্ঞ, দেবতা, পূজা, ঋত্বিক প্রথা এবং আত্মা ও ব্রহ্ম। আত্মা ও ব্রহ্ম নিয়ে চিন্তা এই সময়ে কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। এই দর্শন থেকে উদ্ভব হয়— অদ্বৈততত্ত্ব, দ্বৈততত্ত্ব, বিশিষ্টা দ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি ভাবধারা। 'আমি সেই ব্রহ্ম' এই মহাবোধ এই ভাবধারা থেকেই উদ্ভূত। রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দু দর্শন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভগবত গীতা হিন্দু দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র— যেখানে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা করা রয়েছে।

জ্ঞান থেকে বেদের উৎপত্তি। বেদের আর এক নাম শ্রুতি, যা শুনে শুনে মনে রাখা হয়। কিন্তু এই শ্রবণ শুধুমাত্র শ্রবণ যন্ত্রের মাধ্যমে নয় বরং এটি অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টিতে যে সত্যকে উপলব্ধি বা অনুভব করেছেন তাকেই তাঁরা শব্দের রূপ দিয়েছেন। সেই অর্থে বেদ হলো অন্তঃপ্রেরণার রূপ। বেদে বলা হয়েছে 'ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'— ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁরা শুধুমাত্র লেখক নন। তাঁরা সত্যকে অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, চেতনার উচ্চতর স্তরে পৌঁছে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান লাভ করেছেন।

হিন্দু দর্শনের ছ'টি মূল শাখা রয়েছে যা ষড়দর্শন নামে পরিচিত। এগুলি হলো :

**সাংখ্য :** এই দর্শনে প্রকৃতির ও আত্মা সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যা দ্বৈততত্ত্ব ধারণ করে রেখেছে।

**যোগ :** এই দর্শন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে মোক্ষলাভের পথ দেখিয়েছে।

**ন্যায় :** এই দর্শন জ্ঞান ও যুক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

**বৈশেষিক :** এই দর্শনে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**মীমাংসা :** এই দর্শনে আত্মার স্বরূপ ও পরমাত্মার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাই হিন্দু দর্শন নিছকভাবে তাত্ত্বিক চিন্তা নয় বরং চেতনার উচ্চতর স্তরে পৌঁছে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান। হিন্দু দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি— নিজেকে জানা, যা যুক্তির বাইরে গিয়ে অভিজ্ঞতার বিষয়। যেমন অদ্বৈত বেদান্ত— 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— এটি কেবল একটি চিন্তা নয় বরং এক একজন ঋষির প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধির ফল। □

# ধর্মরাজ্য সংস্থাপক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

**প্রবীর কুমার মিত্র**

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিন্দু সমাজের কাছে আজও মূর্তিমান আদর্শ। তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণ দেশের জন্য কিছু করার প্রয়াসের সফল পরিণতি হলো তাঁর রাজ্যাভিষেক। এই জন্য শিবাজী সাম্রাজ্য দিবস না বলে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব বলা হয়। তাঁর চরিত্র, নীতি, কুশলতা ও উদ্দেশ্যর পবিত্রতা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সেই সময় পরিস্থিতি ছিল হিন্দু সমাজের যেকোনো ব্যক্তি সৈনিক, সর্দার অথবা সেনাপতি হতে পারে কিন্তু রাজা হতে পারে না। এই বিপরীত পরিস্থিতিতে তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিলেন। একজন হিন্দুও যে একজন স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হতে পারেন তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

শিবাজী মহারাজ সীমিত সাধনের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন হিন্দু শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং নিজে শাসক হবার যোগ্য। সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা জাগিয়ে রাষ্ট্রনির্মাণের কুশলী নেতৃত্ব তৈরি করেছিলেন। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের জন্য প্রেরণাদায়ী হিন্দু সাম্রাজ্য তিনি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শাস্ত্র অনুসারে বিধিবদ্ধ সিংহাসন আরোহণ হয়নি। এইজন্য কেউ কেউ শিবাজীকে রাজা মানতে অস্বীকার করে। শিবাজীর জীবনের এই ফাঁক পূরণ করার জন্য কাশীর অন্যতম পণ্ডিত গাগাভট্ট এগিয়ে আসেন। শাস্ত্র অনুসারে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয়। তখন শিবাজীর বয়স ৪৪ বছর। দুর্গম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রায়গড় দুর্গে রাজধানী স্থাপন করা হয়। মাতা জীজাবাঈয়ের চরণ স্পর্শ করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে শিবাজী রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনে আসীন হন। পণ্ডিত গাগাভট্ট শিবাজীর মস্তকে স্বর্ণছত্র স্থাপন করে তাঁকে 'ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ' ঘোষণা করেন। মহিলারা আরতি করেন। সাধুসন্তরা আশীর্বাদ করেন। দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথিরা আনন্দে বিভোর হয়ে মুক্তকণ্ঠে জয়জয়কার করেন 'ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কী জয় হো।' রায়গড় দুর্গ থেকে তোপ দাগা হয়। বীজাপুরের সুলতান এবং ইংরেজরা শিবাজীকে স্বতন্ত্র রাজা হিসেবে মান্যতা প্রদান করে উপঢৌকন পাঠায়। এই ঘটনা দেখে আনন্দবিহ্বল সমর্থ রামদাস বলে উঠেন, 'এই ভূমির উদ্ধার হলো। ধর্মের উদ্ধার হলো। আনন্দময় স্বরাজ্যের উদয় হলো।'

শিবাজী মহারাজ নিজের পৌরুষের দ্বারাই হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পিছনে শিবাজীর ক্ষমতা লিপ্সা ছিল না। তিনি রাজ্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। একসময় রাজ্য ছেড়ে তুকারামের সঙ্গে হরিসংকীর্তনে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সম্পূর্ণ রাজ্য তো তিনি গুরুদক্ষিণা রূপে গুরু রামদাসের চরণে উৎসর্গ করেছিলেন।

শিবাজী মহারাজ যুগপুরুষ ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। হিন্দু সমাজে নব চৈতন্য সঞ্চার করেছিলেন। হিন্দু সমাজের নৈরাশ্য দূর করেছিলেন। হিন্দু সমাজকে হীনম্মন্যতা ও আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত করেছিলেন। ইসলামি শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, গোমাতা, ব্রাহ্মণ, মা- ভগিনীর রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

শিবাজী মহারাজের এক সফল ও আদর্শ শাসক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল। আধুনিক ভারতে যে কয়েকজন শাসক প্রজা কল্যাণকারী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে সুশাসনের আদর্শ উদাহরণ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শিবাজী মহারাজ অন্যতম। মুঘল সাশনের বিরুদ্ধে সেই সময়ে মান-ধন রক্ষা করাই যেখানে দেশিয় রাজাদাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, সেখানে অতি সুন্দর শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন সত্যিই আশ্চর্যের। কিন্তু শিবাজী মহারাজ তা করে দেখিয়েছেন। একদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা, অন্যদিকে প্রজার কল্যাণ সাধন; এই দুইকেই দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন তিনি।

তাঁর জীবন ধর্মনিষ্ঠ ছিল কিন্তু অন্ধবিশ্বাস পূর্ণ ছিল না। তিনি লোকসংগ্রহী ছিলেন কিন্তু অনাবশ্যক তুষ্টীকরণ নীতিতে বিশ্বাস ছিল না। কর্তব্যে কঠোর ছিলেন কিন্তু ক্রুর ছিলেন না। অত্যন্ত কুশল যোদ্ধা ছিলেন। নিজের ছোটো সেনাদল দ্বারা শত্রুপক্ষের বড়ো সেনাদলকে ধ্বংস করার কৌশল তার জানা ছিল। তিনি গেরিলা যুদ্ধের জনক ছিলেন।

পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক দেশভক্ত শিবাজী মহারাজের জীবন থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনও তাঁর জীবন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। নেতাজী বলেছেন— 'ভারতীয়দের সামনে স্বাধীনতা যুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য শিবাজীর মহারাজের উদাহরণ রাখা উচিত।' 'অভিনব ভারত' দলের সদস্যরা শিবাজী মহারাজের চিত্রের সামনে শপথ নিতেন। শিবাজী মহারাজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীবালাসাহেব দেওরস বলেছেন, 'শিবাজী মহারাজের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল যুদ্ধে নেতৃত্ব দানের মধ্যেই সীমিত ছিল না। সারাটা জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটানো সত্ত্বেও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এত সুষ্ঠু ও সুন্দর ছিল যে তা ভাবতেও অবাক লাগে। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি সব ব্যাপারেই ছিল সুব্যবস্থা। এমনকী দেশের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন। হিন্দু জীবনাদর্শে রাজার যে আসন ও মর্যাদা চিহ্নিত আছে সব কষ্টিপাথরে বিচার করলেও তিনি ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজ্যে প্রজার উপর কোনো উৎপীড়ন ছিল না।' শিবাজী মহারাজের সাম্রাজ্যের শক্তির মূল উৎস ছিল বিভিন্ন মরাঠা সেনাপতিদের নিয়ে গঠিত মারাঠারাজ্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, 'শিবাজী পরমাণুর মতো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মরাঠা জাতিকে একটি শক্তিমান জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তিনিই আধুনিক আত্মসচেতন হিন্দু জাতির পূর্ণ অতিব্যক্তি লাভের দীক্ষাদাতা।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় বলেছেন— ''এক ধর্ম-রাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'' ''...একধর্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন করিব সম্বল।'' □

# সমগ্র ভারতবাসীর নিকট প্রণম্য লোকমাতা অহল্যাবাঈ

**সুতপা বসাক ভড়**

মহারানি অহল্যাবাঈ দ্বারা বিভিন্ন মন্দির, ঘাট, ধর্মশালা নির্মাণ, জীর্ণোদ্ধার এবং সংরক্ষণ কার্যের রাষ্ট্রীয় মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। নিজ প্রজাদের কল্যাণার্থে তিনি এইসকল ধর্মকাজের জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থরাশি সমর্পণ করেন, যা তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। এইসকল দানের জন্য একজন দক্ষ প্রশাসক থেকে লোকমাতারূপে ভারতবাসী তাঁকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি ভারতবর্ষের সাতটি শহর (অযোধ্যা, কাশী, মথুরা কাঞ্চী, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা) এবং চারটি কোণায় বদ্রীনাথ থেকে রামেশ্বরম এবং সোমনাথ থেকে পুরী পর্যন্ত ধর্মার্থে বহু কাজ করেছেন। যেহেতু হোলকর পরিবারের ইষ্টদেব শিব, সেজন্য অহল্যাবাঈয়ের অধিকাংশ দান বিভিন্ন শিবমন্দিরে সমর্পণ করা হয়েছে। নিজ রাজ্যের সীমানার বাইরেও ভারতবর্ষের বহু স্থানে বাওরি, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। মন্দিরে বিদ্বান পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধার জন্য আদি শঙ্করাচার্য চার ধাম স্থাপন করেন। এই চার ধামের জীর্ণোদ্ধার করেন রানি অহল্যাবাঈ।

ঔরঙ্গজেব কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে। ১০৮ বছর পরে ১৭৭৭ সালে রানি অহল্যাবাঈ শিবরাত্রির দিন মন্দির পুনর্নির্মাণের সংকল্প নেন। এর তিন বছর পরে মহাশিবরাত্রির দিনই মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় এবং শিবলিঙ্গে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনবার সোমনাথ মন্দির ভেঙেছে ইসলামি আক্রমণে। অহল্যাবাঈ এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন। সম্পূর্ণ মন্দির পরিসর পুনর্নির্মাণ করেন। সিংহদ্বার ও দালান নির্মাণ করেন।

ওঙ্কারেশ্বরে বেশ কিছু বৌরি বা কূপ তৈরি করে দেন এবং মহাদেবের নিত্যপূজার সুব্যবস্থা করেন। মালেশ্বর মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করান। নাসিকে রামমন্দির নির্মাণ করান, অযোধ্যায় রামমন্দির, সীতারাম মন্দির, ভৈরব মন্দির, নাগেশ্বর মন্দির এবং আরও অনেক মন্দির নির্মাণ করান। উজ্জয়িনীতে চিন্তামণি গণপতি মন্দির, জনার্দন মন্দির, লীলা পুরুষোত্তম বালাজী মন্দির-ঘাট, কুণ্ড, ধর্মশালা, বৌরি নির্মাণ করান। অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীশৈলম্ এবং মহারাষ্ট্রের পারলী বৈজনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের সংস্কার করান।

হণ্ডিয়া, পৈঠন এবং আরও অনেক স্থানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। মধ্যপ্রদেশের ধারে অবস্থিত চিকলদাতে নর্মদা পরিক্রম করতে আসা ভক্তদের জন্য ভোজনালয় স্থাপনা করেন। শূলপাণেশ্বরে মহাদেবের একটি বিশাল মন্দির এবং ভোজনালয় নির্মাণ করান। মধ্যপ্রদেশের খরগোনে মণ্ডলেশ্বরে মন্দির এবং বিশ্রামগৃহ নির্মাণ করান। নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির স্থাপন করেন মাণ্ডুতে। নাথদ্বারাতে মন্দির, ধর্মশালা, কুয়ো, কুণ্ড বানিয়ে দেন চিত্রকূট, ঋষিকেশ, পণ্ঢরপুরে শ্রীরামমন্দির, ত্র্যম্বকেশ্বরে একটি সুন্দর জলাশয়, দুটি ছোটো ছোটো মন্দির নির্মাণ করান এবং সেখানে রুপোর তৈরি মহাদেবের মুখাবয়ব নির্মাণ করেন, সেখানে শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, শ্রীহনুমানজীর মূর্তিও স্থাপন করেন।

কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেন, যা অহল্যাবাঈ রোড নামে পরিচিত। এছাড়া গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন স্থানে জলসত্র স্থাপন এবং শীতকালে কম্বল বিতরণ করেন। নিজ জন্মভূমিতেও একটি শিবালয় ও ঘাট নির্মাণ করেন, যা অহল্যেশ্বর নামে খ্যাত। পশ্চিমক্ষেত্রে রাজওয়াড়ার ভেতরে রাজবংশের কুলদেবতা মলহারী মার্তণ্ড মন্দিরে ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেন। এটি মধ্যপ্রদেশের একমাত্র মন্দির, সেখানে তাঁর স্বহস্তে স্থাপিত ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ আজও বিদ্যমান।

একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, তিনি কেবলমাত্র মন্দির নির্মাণ বা জীর্ণোদ্ধার করেননি; তীর্থযাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা, আশ্রম, কুয়ো, ঘাট, পুল, পথ, অন্নসত্র ইত্যাদিও নির্মাণ করেন। এইভাবে তীর্থযাত্রা সুগম হয়ে ওঠে। যেসকল তীর্থযাত্রা বিভিন্ন কারণে দুর্গম ছিল, সেগুলি লোকমাতা অহল্যাবাঈ হোলকরের পুণ্যস্পর্শে আবার শুরু হয়। এর প্রভাবে তীর্থযাত্রীরা দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে সমগ্র ভারতদর্শন ও অনুভব করতে পারতেন। তীর্থযাত্রীরা ওইসকল স্থানে যে রাশি দান করতেন, সেগুলির হিসাব রাখা হতো এবং পুনরায় মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হতো। এভাবে মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণে ভারতবাসীদের অংশগ্রহণ থাকে, এমন ব্যবস্থা করেন। লোকমাতা অহল্যাবাঈ হোলকর অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহসূত্রে হোলকরবংশের রাজরানি, শাসিকা হয়েও স্বধর্ম পালনে অবিচল ছিলেন। আজন্ম শিবসাধিকা ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করে, নিজ কর্তব্যে ছিলেন অটল। একজন নারী হয়েও তৎকালীন সমস্যাগুলি সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে রাখার যে প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন, সেজন্য সকল ভারতবাসীর কাছে তিনি প্রণম্য। তাঁর জীবন সকল মহিলাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। ☐

# ইমাম-মোল্লা-মৌলবিরা ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে

**অমলেশ মিশ্র**

মুসলমানরা হিন্দুদের খুব ঘৃণা করে, কারণ তাদের চোখে হিন্দুরা অংশীবাদী অর্থাৎ বহু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের বহু রকম মূর্তি স্থাপন করে ও মন্দির বানায়। তাই ইসলামি শাসনকালে ভারতে মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সেই স্থানে তারা এক আল্লার উপাসনার জন্য মসজিদ বানাত। মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব এ ব্যাপারে ছিলেন কট্টর মুসলমানদের প্রতিমূর্তি।

Hindu Temples : What happened to them নামে দুই খণ্ডে একটি পুস্তক Voice of India থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক সীতারাম গোয়েল। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের কোন কোন মন্দির কবে এবং কে কে ধ্বংস করেছে তার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমান নবাব বাদশারা এই ব্যাপারে কত উৎসাহী হয়ে কী কী ফরমান জারি করেছিল সে খবর এবং ফরমানের নকল পাওয়া যায়।

ইসলাম প্রবর্তিত হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে। হিন্দুধর্ম আবর্তিত হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে।

আবদুল আজিজ হরফ প্রকাশনী থেকে কোরান এবং অনেক উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন--- 'সুপ্রাচীনকালে সকল আর্যরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই বেদে অগ্নি, বায়ু, পূষণ, ত্বষ্টা, সোম, সূর্য, ঊষা, সরস্বতী, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার উদ্ভব হলো। সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আর্যরাই উপলব্ধি করলেন যে, প্রকৃতির সকল কাজই একটি নিয়মে চলে। ফলে তাঁরা সব কিছুর মূলে একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বললেন, 'এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই।' তিনি অন্যত্র আরও লিখেছেন— 'একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরও ব্যাপক ও গভীর।'

সুতরাং একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কোরান শরিফ বর্ণিত হওয়ার অনেক আগেই একেশ্বর চিন্তা ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

হিন্দুদের একেশ্বর তত্ত্ব এবং মুসলমানদের এক আল্লাবাদ বিষয়ে

ফঃ ৫

ইসলামিক ভয়েস (বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত) পত্রিকায় ১৯৯৮, ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় মৌলবি ড. জাকির নাইক এই বিষয়টি একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদ ও ইসলামিদের আল্লাবাদের মধ্যে মূল প্রভেদ হলো এই যে, হিন্দুমতে এই বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি অণু পরমাণু সবই পবিত্র, সব কিছুতেই ঈশ্বর আছেন— সমস্ত কিছুই ঈশ্বর। কিন্তু ইসলামি মতে সব কিছুই আল্লা নয়— সব কিছুই আল্লার। ''The difference is of apostrophy (')-God's."

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সাধু-সন্তরা তথা ভারতীয় মনীষা--- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বিষয়গুলির বিষয়ে নিস্পৃহ থেকে শাশ্বত সত্য— ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেছেন।

কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনি থেকে জানা যায় যে যমরাজ নচিকেতাকে যাবতীয় ইন্দ্রিয় সুখের ভোগ্য বস্তু দিতে চাইলেও, নচিকেতা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এই কথা বলে যে ভোগ্যবস্তু সমূহ অস্থায়ী, সেগুলি মানুষের ইন্দ্রিয় সকলকে ক্ষয় করে তেজ নষ্ট করে— তাই এগুলিতে আমার প্রয়োজন নেই।

ভারতের মুসলমানরা প্রধানত ধর্মান্তরিত হিন্দু। ফলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর ও মহাকাব্যে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ। কোনো আরবীয় ব্যক্তি তাদের পূর্বপুরুষ নয়।

Indian Islamic Council-এর সভাপতি হিসামুল ইসলাম সিদ্দিকি— একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল Islamic Heritage : Indian Dimension। এই সভায় ইসলামি স্কলার ও গ্রন্থ প্রণেতা ড. রফিক জাকেরিয়া মুসলমান নেতৃত্বকে দোষারোপ করে বলেন— ওই সব নেতারা মুসলমানদের ভুল পথে পরিচালনা করছেন— হিন্দু সমাজের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করছেন। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করায় ফলেই মুসলমান সমাজের এই দুর্গতি। (রফিক জাকেরিয়ার একটি বিখ্যাত পুস্তক— 'The Trial of Benazir Bhutto')।

ভারতে ইংরেজিতে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক--- Organiser পত্রিকায় ১৮.১.৯৮, সংখ্যায় সুহাইল সিদ্দিকি একটি (সভাপতি Organisation of Indian Muslims for change) প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বিদেশি মুসলমান শাসকরা তাদের মজহবি মোল্লাবাদের সাহায্যে ভারতের মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন।

ইন্দোনেশিয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও— সর্বধর্মে সমভাব পোষণ করে। রামায়ণ এখনো সেখানে একটি অগ্রগণ্য পুস্তক।

অথচ ভারতের প্রতিবেশী, ভারতের নাড়ী ছেঁড়া দুই দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলমানরা ভারতকে বেশি ঘৃণা করে। শেক্সপিয়ার লিখেছেন, Near the Blood nearer the Bloody. জানি না এটা আরবীয় সংস্কৃতির রেশ কিনা, যে সংস্কৃতিতে এক ভাই অন্য ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করার জন্য। মৃতপ্রায় দিল্লির হিন্দু রাজা হেমচন্দ্রকে নাবালক আকবরকে দিয়ে গলা ছেদন করে গাজি হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন অভিভাবক বৈরাম খাঁ। গাজি না হলে সিংহাসনে বসতে পারার অধিকারী হয় না। এ সংস্কৃতি আরবীয় বেদুইনদের সংস্কৃতি যা ভারতের মুসলমানরা অনুসরণ করে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে।

আরবভূখণ্ড— সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, কাতার, বাহরিন, সংযুক্ত আরব এমিরিটাস, ইয়েমেন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক— এই আটটি পৃথক ভূখণ্ডে বিভক্ত। প্রতি বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ডে জনবসতি ৬.৭৫ জন। বর্তমান খণ্ডিত ভারতে প্রতি বর্গকিলোমিটার ভূমিতে গড়ে ২৫০ জন বাস করেন। এই আটটি রাজ্য একত্রিত করলে আয়তন দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৭৮ বর্গকিলোমিটার। মরুভূমিকে বাদ দিলে আরবের বাদবাকি ভূখণ্ড হলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরুদ্যান। ওখানে কুয়ো খুঁড়ে সামান্য জল পাওয়া যায়। তাতে যে চাষ হয় তার মধ্যে খেজুরই প্রধান। সামান্য কিছু ফলমূল ও শাকসবজির চাষ হয় কিন্তু প্রধান খাদ্য খেজুর।

আরব উদ্ভূত এই ইসলামে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আরব বেদুইনদের মধ্যে লভ্য। মনে রাখা দরকার যে, আরবের রুক্ষ জলবায়ুর প্রভাব বেদুইন চরিত্রে প্রতিফলিত। এরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। অতিথি সৎকারের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়ী কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা এতই প্রবল ও নিষ্ঠুর যে তারা কথায় কথায় নরহত্যা ও রক্ত ঝরা নীতি অনুসরণ করে। মানুষ হত্যা করা তাদের একটা মামুলি ব্যাপার। বেদুইনদের আত্মকেন্দ্রিকতা সারা বিশ্বের সব মুসলমানের মধ্যেও দেখা যায়। ফলে তারা নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ ব্যতীত অন্যান্যদের ভালোবাসতে পারে না। তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ শুধুমাত্র নিজের মজহবের মধ্যেই। বেদুইনদের মজহব সর্বস্বতা ইসলামিদের মধ্যে প্রবল দেখা যায়।

আত্মকেন্দ্রিকতার উদাহরণ তাদের একমাত্র আল্লার কাছে প্রার্থনার মধ্যেই পাওয়া। আল্লা যেন নবি মহম্মদকে ও প্রার্থনাকারীকে দয়া করেন।

বেদুইনদের দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন নৈমিত্তিক কাজ ছিল। ইসলামে লুণ্ঠন ও লুণ্ঠনের মাল জায়েজ অর্থাৎ বৈধ। বছরের কয়েকটি মাস— মহরম, রমজান, রজব, জিলকদ ও জিলহজ্— রক্তপাত বেদুইনদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল। তারপরেই তারা জেহাদের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষে এসেও মুসলমানরা এই বেদুইন প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারাতো দূরের কথা, অনুসরণই করে। হিন্দুদের মধ্যে যারা বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন, তাদের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। □


*With Best Compliments from -*

**A**
**Well Wisher**

# অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে বালোচদের নৃত্যের মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্তানের পক্ষে না থাকার কথা জানিয়ে বালুচিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও জিন্নার বিশ্বাসঘাতকতায় তা সম্ভব হয়নি। পাক সেনাবাহিনী গায়ের জোরেই দখল করে নেয় বালুচিস্তান। সেদিন থেকেই বালোচরা পরাধীন জীবনযাপন করছেন।

বালুচিস্তান ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৯০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত, যা পাকিস্তানের মোট আয়তনের প্রায় ৪৪ শতাংশ। কিন্তু দেশের ২৪ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ এখানে বাস করেন। ভয়েস ফর বালুচ মিসিং পার্সন্‌সের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, বালুচিস্তান থেকে সাত হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। ইরান ও আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে অবস্থিত এই প্রদেশের অবস্থান অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

বালুচিস্তান হলো পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। এর মাটির নীচে বিপুল পরিমাণ সোনা, তামা, ও অন্যান্য বহুমূল্য ধাতু মজুত রয়েছে। সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে থাকে বালুচিস্তান। কাজেই বালুচিস্তান যদি আলাদা হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তান প্রচণ্ড জ্বালানি সংকটের মধ্যে পড়বে। তাদের তখন বাইরে থেকে জ্বালানি আমদানি করতে হবে। তথ্য মতে বালুচিস্তানে প্রায় ১,৭০০টন সোনা মজুত রয়েছে। বালুচিস্তানকে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম স্বর্ণভাণ্ডার বলেও দাবি করা হয়। এখানে প্রচুর তামাও মজুত রয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ১৭৮ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়াও রয়েছে ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার।

শুধু তাই নয়, এখানে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপাদন হয়। পাকিস্তানে উৎপাদিত খেজুরের ৭০ শতাংশই আসে বালুচিস্তান থেকে। বালুচিস্তানে পর্যটনেরও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আয় হয় এখান থেকে। বালুচিস্তানে ৭৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল রয়েছে

বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সালে বলেছিল— 'ইসলামাবাদের হিসাব অনুসারে বালুচিস্তান লুণ্ঠনের জন্য একটি বিশাল জমি, তেল ও খনিজ পদার্থে ভাসমান একটি শুষ্ক মরুভূমি। তাদের রাজনৈতিক কৌশলের একটি বড়ো অংশ পাকিস্তানি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সুবিধার্থে এই সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়। বালুচিস্তানে গ্যাস, তামা, সোনা, কয়লা ও তেলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যার মূল্য আনুমানিক ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু এই সম্পদের সুবিধা স্থানীয় বালোচদের কাছে পৌঁছয় না।'

ঠিক যেমন দেশভাগ হওয়ার পর পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষিজ সম্পদের ওপর ভর করে পাক-শাসকরা আরাম আয়েসে দিন কাটাতেন। তার বিরুদ্ধেই 'পিণ্ডি নয় ঢাকা' স্লোগান তুলে বাংলাদেশিরা ভারতীয় সেনার সাহায্যে নিজেদের স্বাধীন করেছিলেন ১৯৭১ সালে। আজ ঠিক সেরকম অবস্থা বালুচিস্তানেও। বালোচরা যখন পূর্ণ স্বাধীনতার পথে আন্দোলনরত, তখন নতুন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে ইসলামাবাদের। বালুচিস্তান হাতছাড়া হলে আসলে দেউলিয়া পাকিস্তান একেবারে ভিখিরি দেশে পরিণত হবে বলে সকলে মনে করছেন।

আরও জানা গিয়েছে যে ১১ মার্চ ২০২৫-এ বালোচ লিবারেশন আর্মি সকাল ৯টায় কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী 'জাফর এক্সপ্রেস' নামক ট্রেনটি হাইজ্যাক করে নেয়। ওই ট্রেনে প্রায় ৫০০ যাত্রী ছিল। ট্রেন হাইজ্যাক করে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে তারা স্বাধীনতা লাভের পথে এগোচ্ছে। এছাড়া জানা যাচ্ছে— তারা নাকি ভারতের কাছে আর্জি জানিয়েছে যে ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতের হাতে বন্দি ৯৩ হাজার পাক সেনার হাতে থাকা পুরনো রাইফেল এবং প্রতিটি রাইফেলের সঙ্গে মাত্র ১০টি করে গুলি আমাদের দিক। তাহলেই আমরা পাকিস্তানকে বুঝে নেব।

বালুচিস্তান যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তবে পাকিস্তানের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়বে। আফগানিস্তানে তালিবানের শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে চাপে রয়েছে পাকিস্তান। তালিবানদের সঙ্গে প্রায় সময়ই তাদের সংঘর্ষের খবর খবর পাওয়া যায়। বালুচিস্তান এতদিন ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের মাঝে দুর্গের মতো কাজ করত। যদি বালুচিস্তান না থাকে, তবে আফগানিস্তান যেকোনো সময়ে আগ্রাসন দেখাতেই পারে। কেননা পাক-আফগান সীমান্তের ডুরান্ড লাইন তারা কোনোদিনই মানেনি বা এখনো তারা তা মানে না। ফলে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও কূটনীতিতে প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

গত ৯ মে পাকিস্তানের হৃদকম্প বাড়িয়ে বালুচিস্তান প্রদেশের বালোচ স্বাধীনতাকামীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। 'অপারেশন সিঁদুরের' মধ্যেই বালোচ লিবারেশন আর্মি বালুচিস্তান প্রদেশের বোলান ও কেচ অঞ্চলের দুটি পৃথক হামলা চালিয়ে ১৪ জন পাক সেনাকে খতম করেছে। তাছাড়া বালোচরা কোয়েটা-সহ কয়েকটি শহর দখল করে সেখান থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বালোচ পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে বালুচিস্তানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য আবেদন করেছে। উপরন্তু ভারতের কাছেও তারা বালুচিস্তানকে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে এবং ভারতে তাদের দেশের দূতাবাস খুলতে চেয়েছে।

বালোচরা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে। ভারত যখন অপারেশন সিঁদুর নামে পাকিস্তানের মধ্যে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একের পর এক জঙ্গি শিবির এবং বিমান ঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, সেই দৃশ্য দেখে এক বালুচ নাগরিক আনন্দে নৃত্য শুরু করেছেন। তাঁর সেই নৃত্যের দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েও পড়েছে। অনেকেই বলছেন, বালোচরা যে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে সেটাই নৃত্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন তিনি।

সারা বিশ্ব জানে পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসবাদী দেশ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে সেদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের লালনপালন করা হয়। আর ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস চালানো হয়। অথচ নিজের দেশের জনগণের প্রতি শাসকের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। সরকার ও সেনার দমন-পীড়নে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বালুচিস্তান, সিন্ধ, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রভৃতি প্রদেশের জনগণ আজ বঞ্চিত, শোষিত ও বিপন্ন। তাই বালোচদের স্বাধীনতা ঘোষণাকে শান্তিপ্রিয় দেশের সমর্থন জানানো উচিত বলেই অনেকে মত প্রকাশ করছেন। □

# পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত নাট্যোৎসবে সংস্কার ভারতীর নাটক—‘কেন চেয়ে আছ গো মা’

**অমিতাভ মুখোপাধ্যায়**

ভারত সরকারের সংস্কৃতি কেন্দ্র দ্বারা আয়োজিত নাট্য উৎসবে (২৪-৩০ মে ২০২৫) চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’, পরিবেশনায় সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ। রচনা, নির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন অমিত দে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান না পাওয়ার আজ তাঁরা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতার অমৃতকাল পালনের সময় থেকেই সংস্কার ভারতী এই সব বিস্মৃতপ্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এই যোজনার প্রথম উপস্থাপনা ছিল সুপ্রতীম সরকারের গল্প অবলম্বনে তপন গাঙ্গুলির নাট্যরূপে, সুপ্রীতি ভদ্রের পরিচালনায় নাটক ‘নাম সুশীল’। এবারের নাটক বঙ্গের প্রথম রাজবন্দি অগ্নিকন্যা ননীবালা দেবীর জীবন আধারিত—‘কেন চেয়ে আছ গো মা’।

ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গের বহু মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে ননীবালা দেবী ছিলেন অন্যতম। নাটক বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গের সশস্ত্র আন্দোলনের সময়কালের। ননীবালা দেবীর ১৮৮৮ সালে জন্ম এবং তৎকালীন বাল্য বিবাহের প্রথা মেনে মাত্র ১১ বছর বয়সে বিবাহ আর ১৬ বছর বয়সেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসা। তারপর কালক্রমে স্থানীয় বিপ্লবীদের শ্রদ্ধার পিসিমা থেকে ‘মণিমা’ হয়ে ওঠা। সেই সময়কালে একজন বাঙ্গালি হিন্দু ঘরের বিধবা কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা হয়ে উঠলেন সেই কাহিনি নিয়েই নাটক ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’।

চরিত্র চিত্রণে ননীবালা দেবীর ভূমিকায় সবিতা দে অনবদ্য। জেলবন্দি রামচন্দ্রের (ঋষভ কমল দে) কাছ থেকে গোপন খবর আনার জন্য বিধবা হয়েও রামচন্দ্রের স্ত্রী সেজে জেলের ভিতর যাওয়ার অভিনয় বা তাঁর বন্দি দশায় পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে পুলিশ অফিসারের মুখে সজোরে চড় মারার দৃশ্য দর্শককুলকে হর্ষোৎফুল্ল করে তোলে, যেন তারাও ননীবালা দেবীর মাধ্যমে একটা জোরালো চড় মারতে পারলেন। এক্ষেত্রে সবিতা দেবী ও অত্যাচারী পুলিশ অফিসার প্রবীর ঘোষের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। ননীবালা দেবীর পিতা সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাড়িওয়ালার ভূমিকায় পার্থসারথী চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ না করলেই নয়, বিশেষ করে থানার ননীবালার খবর জানার জন্য পুলিশি অত্যাচারের সময় তাঁর হতাশা, মেয়ের প্রতি অত্যাচারের খবরে তাঁর মনের কষ্টপ্রকাশ দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে, সেই সঙ্গে অত্যাচারী দুই পুলিশ অফিসারের (শুভময় মুখোপাধ্যায় ও সৈকত মুখোপাধ্যায়) প্রতি তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। তাঁদের অভিনয়ও প্রশংসার দাবি রাখে।

বাড়িওয়ালা মাসিমা ও দুকড়িবালা দেবীর চরিত্রে মন্দিরা দে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, দুটি ভিন্ন চরিত্রে অল্প সময়ের ব্যবধানে যথাযথ অভিনয়ের মাধ্যমে। পরিচালক অমিত দে অত্যাচারী পুলিশ অফিসার জীতেন ব্যানার্জির ভূমিকায় যেমন ছিলেন অনবদ্য, তেমনই তিনি এই নাটকে একঝাঁক তরুণ তরুণীরা অনবদ্য অভিনয় করল। রামচন্দ্রের চরিত্রে ঋষভ কমল দে বেশ পরিণত অভিনয়ের ছাপ রাখল, তেমনই অমরেন্দ্র-মায়াঙ্ক দে সরকার, যদুগোপাল-অগ্নিভ দে, বিজয়-আদিল মুখোপাধ্যায়, ছোটো ননীবালা-অনুশ্রী দত্ত এবং প্রতিষ্ঠা দেব, প্রত্যেকের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে, প্রতিটি চরিত্রের সঠিক রূপায়ণ নাটকের গতিকে ধরে রাখতে সফল হয়েছে। আগামী দিনে অভিনয় জগতে এরা জায়গা করে নেবে তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। অনির্বাণ পাঁজাও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র— পাণ্ডেজী, বাড়িওয়ালা ও ম্যাজিস্ট্রেট— যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিশেষে বলা যায়, সংবাদিক স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ও সঠিকভাবে নাটকের সূত্র ধরে রেখে সাবলীল ভাবে নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন। □

চন্দ্রশেখর (বাঁ দিকে) এবং সঞ্জীব কুমার

# ওরাও এগোচ্ছে

**নিলয় সামন্ত**

বিহারে '২০২৫ খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে' ফুটবল ইভেন্টের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বেগুসরাই জেলার বারাউনি শহরকে। মূলত এই সিদ্ধান্তের পিছনে সংগঠকদের মাথায় ছিল এই এলাকায় ফুটবলের প্রবল জনপ্রিয়তার বিষয়টি। তাদের সেই আশাকে সত্যি করে বারাউনির মানুষজন এই ইভেন্টের ম্যাচগুলিতে উৎসাহের সঙ্গে গ্যালারি ভরিয়েছেন। এমনকী প্রতিযোগিতা থেকে তাদের রাজ্য বিহার বিদায় নিলেও মাঠে দর্শক সমাগমে ভাটা পড়েনি। কিন্তু বিহারের মতো একটা রাজ্য, যাদের ফুটবল নিয়ে কোনো মাথাব্যথার কথা শোনাই যায় না, সেখানে একটা জায়গা এমন ফুটবলপাগল হয়ে গেল কীভাবে! এখানেই উঠে আসছে এমন দু'জন মানুষের নাম যাঁরা এই অঞ্চলের ফুটবল সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন। একজন হলেন বর্ষীয়ান ক্রীড়া সংগঠক ও আদ্যন্ত ফুটবলপ্রেমী চন্দ্রশেখর এবং অপরজন মোহন বাগানের প্রাক্তন গোলরক্ষক সঞ্জীব কুমার সিংহ।

চন্দ্রশেখর দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত। ৯০-এর দশকে কোনো একদিন, বারাউনিতে, বাইরের দুটি মহিলা ফুটবল দলের প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন তিনি ও তাঁর সহযোগীরা। ওই ম্যাচে একটি দল কোনো কারণে আসতে পারেনি। ফলে মানসম্মান রাখতে এলাকার অনভিজ্ঞ মেয়েদের নিয়ে তড়িঘড়ি একটি দল বানিয়ে মাঠে নামিয়ে দেন তাঁরা। এই ম্যাচে বাজেভাবে পরাজিত হয় এলাকার মেয়েদের দলটি, সেইসঙ্গে অনভ্যাসবশত অনেক মেয়েই চোট পায়। এই ঘটনা চন্দ্রশেখরের মনে খুব নাড়া দেয় এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন এলাকায় ফুটবল দল গড়বেন, ভালো কোচ নিয়ে এসে শহরের ছেলে-মেয়েদের খেলা শেখাবেন। এব্যাপারে তিনি আরও অনেককে পাশে পেয়ে যান, অনেক অর্থসাহায্য আসে। চালু হয়ে যায় ফুটবল কোচিং ক্যাম্প, যেখান থেকে পরবর্তীতে বিহার রাজ্য দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটবলার জোগান দেওয়া হয়েছে। এই ক্যাম্পের ফুটবলার পুনম পরবর্তীতে ভারতের মহিলা জাতীয় দলেও খেলেছেন।

চন্দ্রশেখর যে চারাগাছটি পুঁতেছিলেন, তাকে পরিচর্যা করে মহীরুহ বানাতে এগিয়ে এসেছেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই। এঁদের মধ্যে একজন সঞ্জীব কুমার সিংহ, যিনি এই এলাকা থেকে উঠে এসে কলকাতায় নিজের ফুটবল কেরিয়ার তৈরি করেছেন এবং একসময়ে মোহন বাগানেও খেলেছেন। এই প্রাক্তন গোলরক্ষকের কাছে বিকল্প ছিল সেনাবাহিনীর চাকরি করার, কিন্তু তিনি নিজের আর্থিক সমস্যার কথা না ভেবে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন এবং শহরে ফিরে ফুটবলার তৈরিতে এবং এলাকার ফুটবল পরিকাঠামো উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তাঁর হাত ধরেই বিহারের প্রধান ফুটবল হাব হয়ে উঠেছে বারাউনি। যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী যমুনা ভগতের নামে একটি স্টেডিয়াম রয়েছে এবং স্থানীয় ইন্ডিয়ান অয়েল রিফাইনারির আরও একটি স্টেডিয়াম রয়েছে। এর আগে '২০১৮ সন্তোষ ট্রফি'র খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানে, এবার আরও একটি সর্বভারতীয় ইভেন্টের খেলা আয়োজন করলো এই দুই স্টেডিয়াম। বিহার রাজ্য দলে বর্তমানে প্রায় ৭০ শতাংশ ফুটবলার বেগুসরাই জেলার, যার বেশিরভাগই বারাউনি ও সংলগ্ন এলাকার। বিহার আন্তঃজেলা ফুটবলে রেকর্ড সংখ্যক ১২ বারের চ্যাম্পিয়ন বেগুসরাই জেলা, যার সিংহভাগ কৃতিত্বই বারাউনির ফুটবলারদের। এবারের খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে আসা স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই) স্কাউটরা বিহারের যে কয়েকজন ফুটবলারকে বেছে নিয়েছেন তাদেরও বেশিরভাগের বাড়ি এই বারাউনি ও আশেপাশের গ্রামে। এগুলোই তাদের সার্থকতা বলে মনে করছেন চন্দ্রশেখর, সঞ্জীব কুমার সিংহা। এবার রাজ্যের গণ্ডী পার করে দেশের ফুটবল মানচিত্রে বারাউনি তথা বেগুসরাই জেলাকে তুলে আনার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা। □

পরিবেশ ভাবনা

নবাঙ্কুর

# সমুদ্রকেও বাঁচাতে হবে

ছোটো বন্ধুরা, চলো, পৃথিবী বাঁচাতে সমুদ্রের কথা শুনি। সমুদ্রের গল্প আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু সেই সমুদ্রকে তেমন করে চিনতে, বুঝতে শেখানো হয়নি কখনোও। একদিন স্বর্গের দেবতারাও ছুটে গিয়েছিলেন সমুদ্রের কাছে। অমরত্বের জন্য দেবতাদেরও অগাধ ঋণ এই সমুদ্রের কাছে।

পৃথিবী তো সৃষ্টি হয়েই আজকের মতো হয়ে যায়নি। জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডটি তাপ বিকিরণ করতে করতে পরিবর্তিত হয়েছে আজকের পৃথিবীতে। তারপর প্রাণের সৃষ্টি। বিজ্ঞান জানিয়েছে, এক 'গরম তরল স্যুপ' সমৃদ্ধ সমুদ্রে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্বের প্রথম প্রাণ। জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ আজকের এই পৃথিবীর সবকিছুই সেই সমুদ্রের কাছে ঋণী।

এক সময় পৃথিবীর বুকে জেগে ওঠা বিভিন্ন সভ্যতার জনপদ আর স্থলভাগকে জুড়তে চাইল মানুষ। 'বাণিজ্য' আর 'উপনিবেশ' নাম হলো তার। নিজেদের প্রয়োজনে শাসন করতে চাইলো সমুদ্রকে, জলরাশিকে। পেট্রোলিয়ামের মতো খনিজ তেল উত্তোলনের কারণে বিপদগ্রস্ত হতে থাকলো সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র। ভোগসর্বস্ব মানুষের প্রাচুর্যময় জীবনযাপনে অন্য সব আবর্জনার সঙ্গে প্লাস্টিক, তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সহ অসংখ্য অপচনশীল উপাদানে পূর্ণ হতে থাকলো সমুদ্রগর্ভ। ভয়ংকর সংকটে পড়লো সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য।

একারণেই পৃথিবীর মানুষের বেঁচে থাকাটাই শুধু সংকটপূর্ণ হলো না, পৃথিবীও অস্তিত্বসংকটের মধ্যে পড়ে গেল।

তাই সমুদ্রকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতেই হলো মানুষকে, বাধ্য হয়ে। সারা পৃথিবীতে 'সমুদ্র পরিচ্ছন্ন দিবস' ঘোষিত হলো ১৭ সেপ্টেম্বর। হিন্দু সংস্কৃতি এই পৃথিবীকে মা বলে পূজা করতে শিখিয়েছে। প্রকৃতি-নদী- সমুদ্রের প্রকৃত মর্মকথা স্বাধীনতার অনেকদিন পর্যন্ত অবহেলিত ছিল। জলাভূমি, খোলা মাঠ যে প্রকৃতির বৃক্ক, প্রকৃতির প্রাণস্বরূপ ফুসফুস তা ভুলতে বসেছিল মানুষ এবং শাসককুলও। মেকি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধুয়ো তুলে একেবারে ভুলে যাওয়া হয়েছিল পরিবেশ ভাবনা এবং সমুদ্র পরিচ্ছন্নতার মতো বিষয়কে। বহুকাল পর হিন্দু সংস্কৃতির মর্মকথা ধ্বনিত হলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কণ্ঠে। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করলো 'স্বচ্ছ সাগর ও সুরক্ষিত সাগর' প্রকল্পের। সমুদ্র পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এ-এক নতুন অঙ্গীকার।

আমরা শুধু একথাটাই জানি যে স্থলভাগের গাছপালাই পৃথিবীর অক্সিজেনের প্রধানতম উৎস। কেবল গাছই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয় পরিবেশে। কিন্তু পরিসংখ্যান আর বিজ্ঞান একটু অন্য কথা বলে। এই বিশ্বে যত অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তার ৫০ থেকে ৮০ শতাংশের উৎসই সমুদ্র। হ্যাঁ, সমুদ্রই। সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে বেঁচে থাকা সবুজ প্ল্যাংকটন এই অক্সিজেনের জোগান দেয়। আজকের ছোটোরা অনেকেই জানে এই তথ্যটা। হয়তো সেই কারণে সমুদ্রের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে সমুদ্র ও তার উপকূলের আবর্জনার যন্ত্রণা। ছোটোরাই তো আগামীদিনের স্বপ্ন, জাতির অগ্রগতির পতাকাবাহী। তাদের মধ্যেই সচেতনতা গড়ে উঠুক সবার আগে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিশালী নেতৃত্বের হাত ধরে 'নতুন ভারত' নির্মাণে তারাও যুক্ত করুক একটি সোনালি পালক। প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মবোধে গড়ে উঠুক প্রাণময় এক বিশ্ব। আমাদের দেশ ভারত সেই নির্মাণের অগ্রমুখ হোক সারা বিশ্বের। সকলের স্বপ্ন হোক এক পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর।

**ডঃ চন্দ্রশেখর মণ্ডল**

## ভারতীয় জাতীয় উদ্যান

# পম্পাদুম শোলা

পম্পাদুম শোলা জাতীয় উদ্যান কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি জেলায় অবস্থিত। এটি ভারতের সবচেয়ে ছোটো জাতীয় উদ্যান। উদ্যানটি শোলা তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রের জন্য পরিচিত। এই উদ্যানে প্রচুর সাপের আবাসভূমি হওয়াই এই নামকরণ হয়েছে। এর চারপাশে জনজাতি মানুষের বসতি রয়েছে। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য এই বনভূমির উপর নির্ভরশীল। এই উদ্যান ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই উদ্যানের পাহাড় থেকে বেশ কয়েকটি নদী উৎপত্তি হয়েছে। এই উদ্যান বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল। এই উদ্যানে পর্যটকদের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হলো শোলাবনে ১০০ প্রজাতির প্রজাপতি দর্শন।

## এসো সংস্কৃত শিখি– ৭১

**অদ্য/ হ্যঃ/ পরহ্যঃ/ প্রপরহ্যঃ**

**আজ/ গতকাল/ গত পরশু/ গত তরশু।**

অদ্য সোমবাসরঃ – আজ সোমবার।

হ্যঃ রবিবাসরঃ – গতকাল রবিবার ছিল।

কদা রবিবাসরঃ ? – কবে রবিবার ছিল?

পরহ্যঃ শনিবাসরঃ – গত পরশু শনিবার ছিল।

প্রপরহ্যঃ শুক্রবাসরঃ – গত তরশু শুক্রবার ছিল।

## ভালো কথা

# আম কুড়োনো

গরমের ছুটিতে মালদায় মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। জহুরাতলা। এখন আমের সময়। সব আম পাকেনি। কিন্তু গাছ ভর্তি আম। চারদিকে শুধু আমের বাগান। পাড়ার মধ্যে বাগান নেই, তবে সবার বাড়িতেই একটি দুটি আমগাছ রয়েছে। কারও কারও বেশি। প্রথম দিনই মামা বলে দিয়েছেন কারও গাছের আমে হাত দেওয়া চলবে না। পাকা বা কাঁচা আম মাটিতে পড়লে সেটা নিতে কোনো দোষ নেই। একদিন দুপুরে ঝড় উঠেছিল। সবাই আম কুড়োতে ব্যস্ত। আমি দুটো আম পেয়েছিলাম। খুব মজা লাগছিল। বোন একটাও পায়নি, তাই কাঁদছিল। তখন আমি একটা ওকে দিলাম। তাতে বোনেরও খুব আনন্দ হয়েছিল।

**সুস্মিতা সরকার,** ষষ্ঠ শ্রেণী, নাগের বাজার, কলকাতা-২৮

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

### গ্রীষ্মকালে বর্ষা

**বিদিশা চক্রবর্তী,** দ্বাদশশ্রেণী, ধবঘাটা, পুরুলিয়া

জ্যৈষ্ঠমাস হয়নি শেষ
বর্ষা এসে হাজির হলো,
গ্রীষ্মের যে দহন জ্বালা
কোথায় যেন হারিয়ে গেল।
রাতদুপুরে ঝমঝমিয়ে
মাঝে মাঝে বাজ
প্রখর তাপের গ্রীষ্মকাল
পেয়েছে বুঝি লাজ!

গ্রীষ্মকালে বর্ষা কেন
শীতকালেতে তাপ?
মানুষ বুঝি করছে বেশি
অনেক অনেক পাপ।
জেনে বুঝেই করছে পাপ
লোভী যত মানুষ
বিশ্বটা যে ধ্বংস হবে
নাই যে কোনো হুঁশ!

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

**PIONEER®**
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

## নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

# মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

## কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

# বাসব অতি সুবোধ বালক মাকু-পাকু-সেকু-নেকুদের চোখে জল

**পিনাকপাণি ঘোষ**

চোখের জলের নাকি কোনো রং হয় না। সবই এক। তবে সবই কি সমান স্বচ্ছ!

মাকু-পাকু-সেকু-নেকুদের চোখের জল দেখেছেন! একটা লালচে, না না সঙ্গে কালচে আভা থাকে। রাষ্ট্রদ্রোহের লালিমা বা কালিমা একটু নজর করলেই দেখা যায়।

আমার পেশাগত জীবন যেমন তারকাখচিত হোটেলবাসের সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনই রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে খাটিয়ায় মাওসঙ্গীদের পাশে শুয়ে তারা গুনেছি। এলোমেলো ভাবনায় ঘুম আসেনি একটুও। আবার শহুরে রাষ্ট্রদ্রোহীর পাশে বসে কাজ করেছি। দামি পারফিউম থাকলেও গায়ে তাঁদের আঁশটে জঙ্গিপ্রেমের বদবু। না, 'বদবু'-র ঠিকঠাক বাংলা শব্দ হয় না। মুখে গরিব মানুষের মসিহা হওয়ার বাণী, কিন্তু আগের রাতের দামি স্কচের গন্ধ।

২০০১ সালের প্রবল গরমের দুপুর। পশ্চিম মেদিনীপুরের (তখন অখণ্ড) ভাদুতলা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানোর কথা ছিল। মাসখানেক আগেই সেখানে হত্যা করা হয়েছে সিপিএমের এক ডাকসাইটে নেতাকে। কিছুটা পরেই লাল টুপির চেনা মুখটি দেখা গেল। মোটর সাইকেলে উঠে বসলাম। ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পরে উঠতে হলো অচেনা মুখের বাইকে। চেনা মুখ ফিরে গেলেন। এইবার চলতে চলতে আঁধার নামল। শাল-মহুলের জঙ্গলে জোনাকির আলো আর বাইকের হেডলাইট। শুকনো পাতা মাড়িয়ে বাইক চলল। ক্লান্ত শরীর যখন বাইক থেকে নামল ক'টা বাজে কে জানে? মোবাইল অনেক দূর, হাতে ঘড়িও ছিল না। দু'চোখে বিস্ময়। মাওবাদী সংসার দেখা প্রথম বার। সেই সময়ে অবশ্য পিডব্লুজি (পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ) নামেই পরিচিত। পরে জেনেছি সেই এলাকাটা ঝিটকার জঙ্গল ছিল। সঠিক কোথায় জানতে পারিনি। শহরে বসে যাঁরা মাওবাদের প্রেমে পড়েন তাঁদের জন্যই এই অভিজ্ঞতা জানানো। নিজের চোখে দেখেছি জঙ্গলবাসীদের ভুল বোঝানোর রাজনীতি, কানে শুনেছি 'স্বাধীনতার যোদ্ধা'-দের জুলুমবাজি আর ভোগের কাহিনি। সেই সফরেই জেনেছিলাম জঙ্গলে মাওযোদ্ধাদেরও প্রেম, যথেচ্ছ যৌনতা, সংসার রয়েছে। জেনেছিলাম, কেন বেছে বেছে খেজুর গাছেই হুমকি পোস্টার সাঁটা হয়। মানুষ খুনের ছকের আড়ালে থাকে গরিবের উপকারী হওয়ার ছদ্মবেশ।

তেমনই একজন ছিলেন কি ছত্তিশগড়ের বস্তারে যৌথবাহিনীর এনকাউন্টারে হত সিপিআই (মাওবাদী) সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশবরাও ওরফে গগন্না? এতটাই কুখ্যাত যে, পুলিশের খাতায় তার মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা। যদিও তার মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের শহুরে নকশালরা যে চোখের জল ফেলেছে সংবাদমাধ্যমে তাতে বর্ণনা অন্যরকম। ইঞ্জিনিয়ারিঙের ডিগ্রিধারী তেলুগুভাষী নেতা নাম্বালা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজ ওরফে গগন্নার 'খ্যাতি' ছিল 'সমরকুশলী' হিসেবে। ২০১৮ সালে সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের 'প্রধান' ছিলেন তিনি। তার আগে ছিলেন সংগঠনের অস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তিগত শাখা 'ট্রাম' (টেকনিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড আর্মস ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট)-এর দায়িত্বে।

**কমরেডরা বড়োই অতীত ভুলে যান। তাঁদের মনেই থাকে না, কমরেড মাও জে দং, কমরেড চে গেভারা, কমরেড হোচিমিন, কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো থেকে কমরেড স্তালিন সকলেই বন্দুক ধরেছিলেন। সাম্যের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য। কিন্তু ইতিহাস বলছে, কিছুই পারেননি তাঁরা।**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'এই অসাধারণ সাফল্যের কারণে আমাদের বাহিনীর জন্য গর্ব হচ্ছে। আমাদের সরকার মাওবাদী আতঙ্ক দূর করতে এবং দেশবাসীর শান্তি ও অগ্রগতির জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' যৌথবাহিনীর 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর সাফল্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মন্তব্য করেন, 'নকশালপন্থার বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধের তিন দশকের মধ্যে এটিই সর্বোত্তম সাফল্য। এই প্রথম আমাদের বাহিনী সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদার এক মাওবাদী নেতাকে মেরেছে।'

শহুরে মাওবাদীরা এখনো রয়ে গিয়েছেন মূলত সাংবাদিকতা পেশায়। তারা বাসবকে হারিয়ে লিখেছেন, জনযুদ্ধ বা পিডব্লুজি-এর প্রতিষ্ঠাতা কোন্ডাপল্লি সীতারামাইয়ার মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন 'সুবোধ বালক' বাসব বা কেশব। সেই পথ ধরেই 'গরিমা'-র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সশস্ত্র গেরিলা আন্দোলনে। অন্ধ্র এবং অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশে নিরাপত্তাবাহিনীর উপর একাধিক হামলায় সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি, দলীয় প্রকাশনা আওয়াম-এ-জং-এর সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যও হয়েছিলেন। জীবনীকারের মতো গুছিয়ে শহুরে নকশালরা লিখেছেন, ১৯৫৫ সালের ১০ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের

ফ ঃ ৬

শ্রীকাকুলামের জিয়ানাপেটায় এক সাধারণ পরিবারে 'মহান' কেশবের জন্ম। পড়াশোনায় 'কৃতী' এবং খেলাধুলোয় 'দক্ষ' ছিলেন। ওয়ারঙ্গলের 'রিজিয়োনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' থেকে বি-টেক ডিগ্রিধারী কেশব এক সময় জাতীয় পর্যায়ের ভলিবল প্রতিযোগিতায় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর সেই 'বহুমুখী প্রতিভা' দেখা গিয়েছিল সাংগঠনিক নেতৃত্বেও। দু'দশক আগেই তাঁর মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় এক কোটিতে!

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে এমসিসি এবং জনযুদ্ধ মিশে জন্ম হয়েছিল নতুন সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র। গত দু'দশকে সেই সংগঠনের অধিকাংশ নেতাই নিহত হয়েছেন নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার দেশ থেকে মাওবাদ নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা করে তার ব্লু প্রিন্টও তৈরি করে। আর তাতেই ২০১৬ সালে অন্ধ্র-ওড়িশা-ছত্তিশগড় সীমানায় সংঘর্ষে দয়া ওরফে গারলা রবি, গণেশ ও মল্লেশের মতো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের মৃত্যু হয়। এই বছরের শুরুতেই ছত্তিশগড়ের গরিয়াবন্দ জেলায় যৌথবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির আর এক পরিচিত সদস্য রামচন্দ্র রেড্ডি ওরফে চলপতির। এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করা যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃতু কিষেণজীর ভাই মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে বিবেক ওরফে সোনুর স্ত্রী তথা সিপিআই (মাওবাদী) দণ্ডকারণ্য জোনাল কমিটির নেত্রী বিমলা চন্দ সিদাম ওরফে তারাক্কা গত ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ২০২১ সালে মহারাষ্ট্রে গড়চিরৌলিতেই সে রাজ্যের পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান কেন্দ্রীয় কমিটির আর এক সদস্য মিলিন্দ তেলতুম্বড়ে।

প্রতিবারই চোখের জলে ভেসেছে কলকাতা। বর্ষাকালের মতো জমে থাকেনি কিন্তু সেই জলে নরম হয়েছে নিউজপ্রিন্ট। আর আমার বারবারই মনে হয়েছে, বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। মনে হয়েছে, বন্দুকই একমাত্র এই মাওবাদীদের অত্যাচার সয়ে-চলা মানুষের চোখের জল মোছাতে পারে। বন্দুকই দেশ থেকে মাওবাদের ক্ষত মেটাতে পারে।

কমরেডরা বড়োই অতীত ভুলে যান। তাঁদের মনেই থাকে না, কমরেড মাও জে দং, কমরেড চে গেভারা, কমরেড হোচিমিন, কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো থেকে কমরেড স্তালিন সকলেই বন্দুক ধরেছিলেন। সাম্যের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য। কিন্তু ইতিহাস বলছে, কিছুই পারেননি তাঁরা। কালের নিয়মে তারা শূন্য থেকে মহাশূন্যের পথে। কমরেড কাকুরা যে 'ইসলাম খতরে মেঁ হ্যায়' বলে গলার শিরা মোটা করেন তাঁরা দিনের শেষে কোলবালিশে মুখ লুকোন। সন্ত্রাসবাদ দমন অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'-এ তাঁদের পাকুমনে আঘাত লাগলেও, কলিজা ফেটে গেলেও বুঝতে পারেন দিন ফুরিয়েছে। সময় গিয়ে, অসময় গিয়ে, এখন শুধুই দুঃসময়। সুবোধ বালক বাসবেরা আর ফিরবে না। মৃত মতবাদের মতো বাসবদের মৃত্যু নিশ্চিত। কারণ, সাধারণ মানুষের জন্য বন্দুক ধরার অভিনয় ধরা পড়ে গিয়েছে।

সেকু-মাকু-কাকুরা কী বলবেন, জঙ্গলে গোরু চরাতে আসা রাখাল, চাষের মাঠে লাঙ্গল ধরা কৃষকের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরাটা 'জায়েজ'! বন্দুক দেখিয়ে দিন বদলের গল্প বলে, পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে টুক করে ভোটের রাজনীতিতে ঢুকে যাওয়ার পরে আপনাদের নেতারা কী করেছেন? কিছু কি বুঝতে পারছেন? মনে করতে পারছেন, কীভাবে অহিংস পদ্ধতিতে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছিল? সেই ট্রেনের সব যাত্রীই কি শ্রেণীশত্রু ছিলেন? কেন তাঁদের খতম হতে হয়েছিল?

শালকু সরেনকে মনে পড়ছে? ২০০৯ সাল। আপনারা চিনতে পারবেন না। রিপোর্টার হিসেবেই গিয়েছিলাম লালগড়ের ধরমপুরে। সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে দেহটা পচে গিয়েছিল। টানা পাঁচ দিন পড়ে ছিল যে। কাছে যেতে দেওয়া হয়নি সিপিএম কর্মী শালকুর বৃদ্ধা মা ছিতামণি সরেনকেও। দেহ দাহ করতে দেওয়া হয়নি। কতবড়ো শ্রেণীশত্রু ছিলেন কৃষক পরিবারের তরতাজা শালকু? গরিবের রক্তে এর পরেও লাল হয়েছে লালগড়ের মাটি। শালকু জানতেও পারলেন না তাঁর প্রিয় দল সিপিএমের পলিটব্যুরো নিন্দা করেছে তাঁকে হত্যা করা মাওবাদীদের নেতা বাসবের মৃত্যুতে। প্রশ্ন করা হয়েছে, একটা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদককে এভাবে কেন হত্যা করল মোদী-অমিত শা-র যৌথবাহিনী? জবাব চাই, জবাব দাও।

আচ্ছা। বস্তার, দান্তেওয়াড়া, গড়চিরৌলিতে যৌথ বাহিনীর জওয়ানদের হত্যাকাণ্ড মনে রাখতে হবে না। 'হত্যা' নয় তো, এগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অ্যামবুশ করা! বরং, কমরেড বুদ্ধদেবের কথা ভাবুন। চিনতে পারছেন না! আরে বাবা সদ্য প্রয়াত কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যিনি। তিনি তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানকে নিয়ে জঙ্গলমহলে শিল্প করতে গিয়েছিলেন। সেই যে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানা। আজও হয়নি। কাদের ভয়ে জিন্দালরা পিছিয়ে গিয়েছে? বুদ্ধদেবও তো আপনাদের দলের মানে একটা কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ছিলেন। তাঁর গাড়ি উড়িয়ে খুনের চেষ্টা করেছিল কারা কমরেড? বাসবের জন্য হা-হুতাশ করার সময়ে স্মৃতির গোড়ায় এক পেগ হুইস্কি ঢালবেন নাকি! দামি স্কচ ঢাললে হয় তো মনে পড়বে যে, একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব।

তখনো শালবনী, ঝিটকার জঙ্গলে গিয়েছিলাম রিপোর্টার হিসেবে। দেখে এসেছিলাম লালগড়ের লাল চোখ। ফিরতে পারব কিনা ভয় ছিল। চারিদিকের রাস্তা কেটে দিয়েছিল বাসবের অনুগামীরা। বুদ্ধদেবকে খতম করতে না পারার আফশোস থেকেই সাংবাদিকদের আটকে রাখার চেষ্টা। পুলিশকে থানায় বন্দি করেও রাখা হয়েছিল।

সাবধান কমরেডরা। দেখবেন, সোডার বদলে স্কচের গ্লাসে চোখের জল না পড়ে যায়। নোনতা লাগবে। কমরেড মনে রাখবেন, গরিব গুর্বো মানুষের ঘামের মতো রক্তের স্বাদও নোনতা। গরিবের বন্ধু সাজার অভিনয় বন্ধ করুন কমরেড। গরিবকে শ্রেণীশত্রু বানানোর নাটকের মঞ্চটা ছাড়ুন। কার্টেন পড়ে গিয়েছে।

শো শেষ কমরেড! দেখতে পাচ্ছেন, অন্ধকারে কটা চোখ জ্বলজ্বল করছে। ওরা গরিব মানুষ। সব দর্শক চলে গিয়েছে। হাততালি দেওয়ার লোকেরা নেই। মঞ্চের সামনে পড়ে থাকা চট গুটোতে এসেছেন ওঁরা।

*বিশেষ প্রতিবেদন*

# পশ্চিমবঙ্গের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন

**সৌরভ সিংহ**

নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ হলো একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যেখানে নদীবিধৌত ভূমি ও কৃষিপ্রধান এলাকা বিস্তৃত, সেখানে পানীয় জলের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা বজায় রাখা একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। অধিক জনসংখ্যা, শিল্পায়ন, কৃষি কাজ এবং নগরায়নের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জলের মান ও সরবরাহ ঠিক রাখা নিয়ে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ঘনবসতি এলাকা। এ রাজ্যের বিশাল জনসংখ্যার জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পানীয় জল প্রাপ্যতা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। যদিও শহুরে এলাকাগুলোর পরিকাঠামো অপেক্ষাকৃত উন্নত, তবুও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর জল সরবরাহ ও গুণগত মান অত্যন্ত দুর্বল। ২০১৩ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ কোটি, প্রায় ৭৬ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বাস করলেও, শুধুমাত্র ৪৭.১৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কাছে নলবাহিত জল সংযোগ রয়েছে, যা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় গ্রামীণ এলাকার নিরাপদ জলের সরবরাহ কতটা কম। অর্ধেকেরও বেশি গ্রামীণ পরিবার এখনো নিরাপদ ও পর্যাপ্ত শুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শহুরে এলাকায় এই হার প্রায় ৮৫ শতাংশ হলেও, পাহাড়ি ও নদীভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলোতে এই সংখ্যা ৩০ শতাংশের কম। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নদীয়া, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ও কলকাতার মতো উন্নত জেলা যেখানে নলবাহিত জল সরবরাহ ৭০-৯০ শতাংশের মধ্যে, সেখানে পুরুলিয়া, আলিপুরদুয়ার ও মুর্শিদাবাদে মাত্র ৩০-৪৫ শতাংশ পরিবার ওই জল পাচ্ছে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক দূষণের কারণে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। ভারতের এনভায়রনমেন্টাল ওয়াটার রিসোর্সের রিপোর্ট অনুসারে মুর্শিদাবাদের ১৫৫টি গ্রামে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরাপদ মাত্রার তুলনায় ৫ থেকে ২০ গুণ বেশি পাওয়া গেছে। এই দূষণজনিত কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় জেলাগুলোর পানীয় জলে লবণাক্ততার মাত্রা বাড়ছে। বিডিএস (ব্র্যাকিশ ওয়াটার ডিফেন্স সোসাইটি) রিপোর্ট অনুসারে, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৪৫ শতাংশ নলকূপে লবণাক্ততা বেড়েছে যা শিশুদের জন্য বিশেষ ঝুঁকির কারণ। ২০১৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই অঞ্চলে উচ্চ লবণাক্ততার কারণে গর্ভবতী নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনি সমস্যার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়। একদিকে এই রাজ্যের নদী ও জলাধারের সংখ্যা বেশি থাকার পরও বহু এলাকায় নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব রয়েছে। এই সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধানের জন্য প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের পানীয় জলের প্রধান সমস্যা ও তার কারণগুলো বোঝা প্রয়োজন। রাজ্যের পানীয় জলের প্রধান উৎস হলো ভূগর্ভস্থ জল ও পৃষ্ঠতলীয় জল। বর্ষাকালে নদী ও পুকুরের জল জমে থাকলেও তা সংরক্ষণ ও ব্যবহার যথাযথ না হওয়ায় শুষ্ক মরসুমে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। জলাধার ও বৃষ্টির জল সঞ্চয় না থাকায় দূরবর্তী গ্রামগুলোতে জল সংকট বাড়ে। অন্যদিকে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ক্রমাগত হ্রাস, ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরতা এবং জল সংরক্ষণের অভাব এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে জলস্তর হ্রাসের কারণে অনেক এলাকায় পানীয় জলসংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকট গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া, গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এসব কারণে রাজ্যের জলসম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

> **পরিবেশের রক্ষা করা মানে নিজেকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। প্রকৃতি আমাদের জীবনদাত্রী, আর তার ভারসাম্য নষ্ট হলে মানবজীবনও ধ্বংসের পথে চলে যাবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব, নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবেশবান্ধব আচরণকে গ্রহণ করা।**

তবে ভূগর্ভস্থ জল প্রধানত গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহৃত হলেও অনেক জেলায় এর মানের সমস্যা গুরুতর (Ground-water Pollution)। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হলো ব্যবহারযোগ্য জলে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে পাওয়া। নদী ও জলাশয়ে শিল্প বর্জ্য, নগরায়নের বর্জ্য এবং কৃষি থেকে সেচের রাসায়নিক পদার্থ যেমন ভারী ধাতু ও রাসায়নিক বর্জ্য জলের সঙ্গে মিশে যায়

এবং তা সরাসরি পানীয় জল ও কৃষি জমির মাটি দূষিত করে। নগর এলাকায় নালা ও বর্জ্যের সঠিক অপসারণ পদ্ধতির (Waste Removal) অভাব দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। ভূগর্ভস্থ জল দূষণ ও সংকটও গুরুতর। রাজ্যের অনেক অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলে আয়রন, আর্সেনিক, ফ্লোরাইডের উচ্চ মাত্রা ধরা পড়েছে, যা মানুষকে নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলেছে। বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান, নদীয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে আর্সেনিক দূষণের ঘটনাগুলো খুবই উদ্বেগজনক। মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়ার কিছু অংশে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রার অনেক বেশি।

পানীয় জল পরিশোধনের আধুনিক সুবিধা সীমিত, বিশেষত দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে জল পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সঠিক ও নিয়মিত পরীক্ষানিরীক্ষা অনেকখানি অনিয়মিত। পাম্প, ট্যাংক ও শোধনাগারের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব থাকায় জল অপচয় ও দূষণ বেড়েই চলেছে। ২০২২ সালের রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুসারে, প্রায় ১৫ শতাংশ জল শোধনাগার আংশিক-কার্যক্ষম বা সম্পূর্ণ বন্ধ। এতে স্থানীয়দের জন্য নিরাপদ জল সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, জলজ রোগের কারণে প্রতি বছর রাজ্যে প্রায় ৩২ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়। ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা ও অন্যান্য জলজ রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল শক্তি মন্ত্রক' (Ministry of Jal Shakti)-এর অধীনে ২০১৯ সালে 'জল শক্তি অভিযান' চালু হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জল পুনঃপূর্ণকরণ এবং জনগণকে সচেতন করা। 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ অঞ্চলে নলবাহিত জল (Tap Water) সংযোগের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আজ ভারতের বহু গ্রামেই বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে গেছে, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। 'জল জীবন মিশন'-এর মতো বৃহৎ যোজনাগুলি শুধু জল সরবরাহই নয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আধুনিক পরিশোধন প্রযুক্তি যেমন আর্সেনিক ফিল্টার, রিভার্স অসমোসিস, বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার, স্মার্ট ওয়াটার মিটার, ইউভি ফিল্টারিং ও ক্লোরিনেশন ব্যবহার এবং পাইপলাইন নেটওয়ার্ক বিস্তার ইত্যাদি বহুবিধার কাজ জরুরি ভিত্তিতে করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই তুলনায় জল জীবন মিশনের কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। পশ্চিমবঙ্গের জল সরবরাহ পরিকাঠামো এখনো অনেকাংশে দুর্বল। রাজ্যের বহু গ্রামীণ এলাকায় এখনো পাইপলাইন নির্মাণ হয়নি (প্রায় ৩৫ শতাংশ) অথবা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। রাজ্যে ইতিমধ্যে জল জীবন মিশন (পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তিত নাম 'জলস্বপ্ন') প্রকল্পের অধীনে ১ লক্ষাধিক নতুন ট্যাপ সংযোগ স্থাপন হয়েছে। তবে, অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য ও উপকূলীয় অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এছাড়াও, রাজ্য সরকার বেশ কিছু আধুনিক প্রকল্প চালু করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন জেলা থেকে ১৩৮টি জল পরীক্ষা ল্যাব উন্নত ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, যা নিয়মিত জলমান পরীক্ষা করছে। শহরাঞ্চলে SCADA নামক এক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে জল সরবরাহের মান নিরীক্ষণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট (RO plant), আর্সেনিক ও আয়রন অপসারণ প্লান্ট (ARP/IRP) স্থাপন করা হয়েছে, যাতে দূষিত জল বিশুদ্ধ করে ব্যবহারযোগ্য করা যায়। জলের অপচয় রোধ ও জল সংরক্ষণের জন্য রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ও বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় সৌরশক্তিচালিত পাম্প বসানো হয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী। স্কুল, হাসপাতাল ও সরকারি ভবনগুলোতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। জল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু হয়েছে, যেমন 'জল সাথী', যেখানে মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNICEF— WaterAid-ও পশ্চিমবঙ্গে জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশে কাজ করছে।

এত বৃহৎ যোজনা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও ভারতের বহু রাজ্যে গ্রীষ্মকালে তীব্র জলসংকট দেখা দেয়। নীতি আয়োগের রিপোর্ট (২০১৪) অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের পর্যাপ্ত সুযোগ হারাবে। দেশের ৭০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জলস্তর আজ বিপজ্জনকভাবে নীচে নেমে গেছে। ভারতের অন্যতম নদীবাহিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। গঙ্গা, দামোদর, তিস্তা, প্রভৃতি নদী এবং অসংখ্য খাল-বিল-মিলিয়ে নদীমাতৃক এই রাজ্যকে একসময় বলা হতো 'জলের দেশ'। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার কারণে পশ্চিমবঙ্গেও জলসংকটের আশঙ্কাজনক চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে জল সংকট হয়তো এখনো অন্যান্য রাজ্যের মতো ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি, তবে এর ইঙ্গিত স্পষ্ট। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলিতে গ্রীষ্মকালে ভয়াবহ জলসংকট দেখা দেয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে নদী থাকলেও বৃষ্টির ঋতুচক্রে পরিবর্তন ও তীব্র বন্যা ও খরার পালাবদলে চরম সংকট দেখা দিচ্ছে। শহর ও মহানগরে (যেমন কলকাতা, হাওড়া), ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন এবং পাইপ লাইনের গড়ে ৩০-৪০ শতাংশ জল অপচয় হচ্ছে লিকেজের মাধ্যমে। গ্রীষ্মকালে ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ করতে হয় বহু এলাকায় (যেমন : বেহালা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ)। জলসংকট এখন কোনো দূরের বিপদ নয়, এটি এখন আমাদের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে। 'জল অপচয় নয়, সংরক্ষণই হোক অভ্যাস'— এই নীতিতে এগোতে পারলেই জল সংকট বন্ধ করা সম্ভব। যদি আমরা সকলে সচেতন হই, জল অপচয় রোধ করি এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করি, তাহলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। আমাদের ছোটো ছোটো সচেতন প্রচেষ্টাই পারে এই বিপর্যয় থেকে মুক্তির পথ দেখাতে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ ও পরিশোধনে সামাজিক জনসচেতনতা প্রয়োজন। প্রত্যেক বাড়িতে, অফিসে, বিদ্যালয় ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণের জন্য বৃষ্টির জল সঞ্চয়, রিচার্জ পিট নির্মাণ প্রয়োগগুলি ব্যবহারে আনতে হবে।

জল হলো প্রকৃতির এর বিশেষ উপাদান। তাই সময় এসেছে সকলে মিলে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন হওয়ার ও উদ্যোগ গ্রহণ করার। পরিবেশের রক্ষা করা মানে নিজেকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। প্রকৃতি আমাদের জীবনদাত্রী, আর তার ভারসাম্য নষ্ট হলে মানবজীবনও ধ্বংসের পথে চলে যাবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব, নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবেশবান্ধব আচরণকে গ্রহণ করা। □

# ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা

**অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য**

১৯২৫ সালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে জন্ম নিল দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার দুটি সংগঠন। একটা রাজনৈতিক, অন্যটা সমাজিক- সাংস্কৃতিক। একটা বিদেশি ভাবনার ভাবধারায় পুষ্ট ও সমর্থক; অন্যটা ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতির পূজারি। প্রথমটা জন্ম নিল রাশিয়ার তাসখন্দে মার্কসীয় জড়বাদের আতুড়ঘরে, যার দেশ থেকে বেশি দেশের বাইরে প্রতি নিষ্ঠা আর বিজয়াদশমীর পুণ্যলগ্নে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের দৃঢ় বন্ধনের শপথ নিয়ে জন্ম নিল এক সামাজিক- সাংস্কৃতি পরিমণ্ডলে— হিন্দুত্ব যার প্রাণ। প্রথমটা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, রাশিয়া-চীনের স্বার্থই বড়ো, দেশের স্বাধীনতা নয়। তাদের ভাষায় ‘We must fight harder for our freedom in order to defend the Soviet Union.’ (Arun Sourie, Illustrated weekly, 08.04.1984)

আর দ্বিতীয়টি হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ‘হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুত্থান’ এবং ব্যক্তিগত জীবন হতে সমষ্টি জীবনের দিকে, দাসত্ব হতে স্বাধীনতার দিকে, নিদ্রা হতে জাগৃতির দিকে, দৈন্য হতে স্বর্গতুল্য সুখের দিকে এবং দুর্বলতা হতে বিজিগীষু মানসিকতার দিকে সমগ্র ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার প্রতিষ্ঠা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের নবধ্রুবতারা সঙ্ঘের জন্ম কি আকস্মিক, না কোনো ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমার ফসল! কারণ দেখা যাচ্ছে সঙ্ঘশক্তির কথা বার বার, যুগে যুগে গুরুত্ব পেয়েছে ভারতীয় চিন্তাচেতনায়। শুধু ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বের প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে— ‘সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।’ মানব সমাজের অগ্রগতির প্রথম ও প্রধান সোপান হলো এই মন্ত্র।

এরপর কেটে গেছে বহু শতাব্দী। সমাজজীবনে ঘনিয়ে এসেছিল স্থূলতা, স্থবিরতা। তাই প্রয়োজন পড়েছিল একজন যোগ্য সাধকের। ভারতের পবিত্র মাটিতে বার বার ভগবানের আবির্ভাব ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ভারতীয় জীবনধারাকে সজীব ও সচল করে রেখেছে। যুগের প্রয়োজনেই সনাতন ধর্মকে গতিশীল, করতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এক বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে আবির্ভাব হলো গৌতম বুদ্ধের। এক শ্রেণীর বিভেদকারী পণ্ডিত হিন্দুধর্ম থেকে বৌদ্ধমতকে আলাদা করে মূল্যায়ন করার পক্ষপাতী। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে রিস ডেভিস দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন— ‘Gautama was born and broughtup and lived and died as a Hindu’। তিনি হিন্দুদের মধ্যে মহত্তম, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং আজীবন তিনি ছিলেন একজন ভারতীয়। স্বয়ং বুদ্ধদেব স্বীকার করেছেন তাঁর প্রচারিত মত বৈদিক অনুসারী।

আবার মধ্যযুগীয় ভারতে ইসলামি আগ্রাসনের ক্রমস্পর্ধিত উদ্ধত তরবারির মোকাবিলা করার জন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ‘সঙ্ঘে শক্তির কলৌযুগে’ অর্থাৎ কলিযুগে সঙ্ঘ শক্তির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তো বলেই দিয়েছিলেন, অটুট সঙ্ঘশক্তি ছাড়া একটা জাতি সমুন্নত হতে পারে না। তাই দেখা যায় যুগে যুগে সঙ্ঘশক্তি ভারতীয় সভ্যতার নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে।

১৯২৫ সালে হিন্দুজীবনের নবীন প্রভাতের কলকাকলি শোনাতে, নবভারত জাগৃতি কল্পে, একটি ঐতিহ্যশালী সঙ্ঘশক্তি প্রতিষ্ঠা হবে তার সব ব্যবস্থা ঈশ্বর যেন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলেন। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বৌদ্ধমত, বৈষ্ণবমত ও কলকাতার ঠাকুর পরিবারের ‘হিন্দুমেলা’-র ভাবনা সবেতেই সঙ্ঘশক্তির কথা বলা হয়েছে।

সুদূর অতীতের স্বর্ণযুগে না গিয়েও যদি আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর কথাই ধরি দেখতে পাবো নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, যাঁর মধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জনকল্যাণ চেতনা ও বিশ্বমৈত্রী ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই দিব্য জ্যোতিষ্কের আলোকজোতি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মধ্যে। ক্রান্তদর্শী নিত্যানন্দ প্রভু অনুভব করেছিলেন, ‘আজকের শিশু-কিশোররাই আগামীকালের দেশের, দশের কর্ণধার। তাই তিনি আপন অনুগত আউল মনোহরকে মুখ্য নেতত্ব দিয়ে এ দেশের দিকে দিকে ছোটো ছোটো গোষ্ঠী (দল)-তে পাঠাতে লাগলেন, যারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠন তথা নৈতিক উন্নতির বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেবে এবং উপযোগী শিক্ষা দেবে।’ তেমনই প্রাতস্মরণীয় ডাঃ হেডগেওয়ারও চিন্তন করেছিলেন আজকের শিশুরাই ভাবী ভারতের কর্ণধার। তিনিও শিশু-বালকদের শাখাস্থান অভিমুখীকরণের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন তরুণদের শরীরচর্চা, স্বাস্থ্যচর্চার উপর জোর দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই ডাক্তারজীও শিশু-বালক-তরুণদের শাখার মাঠে খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগাসনের মাধ্যমে দৃঢ় দৈহিক গঠন, সবল চিন্তাধারা এবং শাখায় ‘ভারতমাতা কী জয়’ প্রার্থনা বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে দেশ ও হিন্দুত্বের প্রতি ধ্যেয়নিষ্ঠ হওয়ার প্রেরণার ব্যবস্থা করে গেছেন।

হিন্দুজাতির হিত কামনায় ১৮৬৭ সালে কলকাতার ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘হিন্দুমেলা’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখেন, 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হয়েছিল।' সম্পাদক হন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরকারী সম্পাদক হন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর কার্যপদ্ধতির বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল— ১. বছরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা এবং ২. 'মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কী আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।'

শুধু উদ্দেশ্য থাকলেই হবে না, প্রয়োজন উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা। হিন্দুমেলার কার্যকর্তারা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ছয় প্রকার পন্থা নির্ণয় করেন। যেমন— ১. এই মেলা পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ মণ্ডলী গঠিত হবে, তাঁরা হিন্দুজাতিকে এই মেলার লক্ষ্য বিশেষভাবে বোঝাবেন এবং এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকবেন। ২. প্রত্যেক বছরে আমাদের এই হিন্দু সমাজের কতখানি উন্নতি হলো সেই বিষয়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে সাধারণের উপস্থিতিতে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠ করা হবে। ৩. অস্মদ্দেশীয় যেসব ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনে উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হয়েছেন তাঁদের উৎসাহ দান করা হবে। ৪. প্রতি মেলায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উৎপাদিত পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে প্রদর্শন করা হবে। ৫. এই মেলায় স্বদেশীয় সংগীতে নিপুণ ব্যক্তিদের উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং ৬. যাঁরা মল্ল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের প্রতি মেলায় একত্রিত করে সম্মাননা প্রদান করা হবে এবং স্বদেশীয় লোকেদের ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলন করা হবে। এইসব পন্থা সাধনে যে সকল ব্যক্তিদের যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন— রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য, অম্বিকা চরণ গুহ প্রমুখ। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রায় ছয় দশক আগেই তার বীজ রোপিত হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির তত্ত্বাবধানে হিন্দুমেলার উর্বর ভূমিতে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে লেখেন— 'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পরিবারে বিদেশি প্রথার কতকগুলি বাহ্য অনুসরণ অনেকদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের পরিবারে হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশনানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মতো বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।' হিন্দুমেলার বিভিন্ন আলোচনার জন্য ঠনঠনিয়ার একটি পোড়ো বাড়িতে সভা বসত যা ছিল গোপন সভা। এই সভায় আদি ব্রাহ্ম সমাজ গ্রন্থগার থেকে আনা হয়েছিল লাল রেশমের কাপড়ে জড়ানো বেদমন্ত্রের একটা পুঁথি। এই সভাগৃহে ছিল একটা টেবিল। টেবিলে ছিল দুটি মড়ার মাথা। মাথার চক্ষু দুটির কোঠরে দুটি মোমবাতি থাকত। এটা ছিল এক সাংকেতিক রূপক ভাবনায় ভাবিত। মড়ার মাথা ছিল মৃত ভারতের সংকেত আর চোখের বাতিলগুলি ছিল মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার এবং তার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করার চেষ্টা। ডাক্তারজী বহুদিন কলকাতায় ছিলেন, তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন মানুষ। ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিচ্ছুরিত আলোকজ্যোতির সন্তান। হিন্দুমেলার এই সব ঘটনা ও আদর্শের কথা তিনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন।

সুগভীর ও সুদীর্ঘ অতীতের পাতা যতই উলটানো হবে দেখা যাবে যুগে যুগে সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। আজ নবনির্মিত ভারত নির্মাণের মূল কারিগর সঙ্ঘ। ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাভিমানী ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে ডাক্তারজী আর পাঁচটা তরুণের মতো তিনিও জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু নেতাজী-সহ চরমপন্থী নেতাদের মতো কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁরও মোহভঙ্গ হয়। বিশেষ করে তুরস্ককে কেন্দ্র করে খিলাফতের নামে যে জেহাদ শুরু হয় তার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করার কী কারণ ছিল তা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতো ডাক্তারজীকেও ভাবিয়ে তুলেছিল।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ নভেম্বর অখিল ভারতীয় খিলাফত পরিষদ গঠিত হয়। গান্ধীজীর সক্রিয়তায় হিন্দু-মুসলমান সকলকেই শামিল হতে বলা হলো। শুধু তাই নয় ওই পরিষদের সভাপতি হিসেবে গান্ধীজী যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি স্পষ্ট হলেন--- 'আমরা হিন্দু-মুসলমান একতার কথা বলি। কিন্তু মুসলমানদের উপর বিপত্তি এলে আমরা হিন্দুরা যদি পিছিয়ে পড়ি তাহলে একতার ঘোষণার অর্থ কী? কিছু লোকে বলে যে, আমাদের মুসলমানদের শর্ত সাপেক্ষে করা উচিত, কিন্তু প্রকৃত সাহায্য তো নিস্বার্থ হওয়া উচিত।'

গান্ধীজীর এই বক্তব্যকে অনেকেই মুসলমানদের হাতে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' তুলে দেওয়ার নীতি বলে মন্তব্য করেন। ডাক্তারজীকে চরমভাবে ভাবিয়ে তুলল গান্ধীজীর এই বক্তব্য। তাহলে তিনি যে শক্তিশালী, স্বাভিমানী, আত্মনির্ভর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন তার কী হবে? কংগ্রেস তো স্বাভিমানী ভারত রাষ্ট্র নির্মাণ করবে না, কংগ্রেস তো 'সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজ' অথবা 'উপনিবেশিক স্বরাজ' লাভেই সন্তুষ্ট, কিন্তু ডাক্তারজী তো 'শুদ্ধ স্বরাজ' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন-ই না। শুরু হলো মানসিক দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলেন। ভাবলেন কংগ্রেসে থেকে কিছু করা যাবে না। তাঁর স্বপ্নের বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করা যাহে না।

তিনি ছিলেন ইতিহাস সচেতন মানুষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনি পড়েছেন, জেনেছেন। ইতালির জাতীয় আন্দোলনে ম্যাৎসিনীর অবদান এবং তাঁর আন্দোলন পন্থা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। ইতালির আন্দোলন ইতালীয়দের নিয়ে করতে হবে। এই জন্য ম্যাতসিনি ইয়ং ইতালি প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্য ইতালির যুব সমাজকে জাতীয় ঐক্য আন্দোলনে শামিল করা। এই জন্য তিনি 'কার্বোনারি' নামে এক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। এই গুপ্ত সমিতিও তাদের দেশের ধর্মীয় বিশ্বাসে গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল। এই কার্বোনারির গুপ্ত সমিতির সদস্যদের নির্দিষ্ট পোশাক বিধি ছিল। হয়তো ডাক্তারজী ইতালির এই গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্য পদ্ধতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন বা বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্য তিনিও স্বয়ংসেবকদের দিলেন রাষ্ট্র সেবার, নতুন ভারত নির্মাণের দর্শন—হিন্দুত্ব।

এভাবে দেখা যায় হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ইতিহাসের ধারা অব্যাহত প্রতিষ্ঠা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। হয়তো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে বা বলা ভালো নির্মাণের প্রয়োজন ছিল, তা না হলে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে বর্ণিত 'মা কী ছিলেন, কী হইয়াছেন আর মা কী হ'বেন' ভবানন্দের অঙ্কিত স্বপ্নের ভারতমাতাকে পেতাম না। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দীর্ঘ একশো বছর ধরে হৃদয়তন্ত্রের এক গভীর অন্তঃস্থলে পরম আরাধ্যা জননী রূপে ভারতমাতাকে লালন পালন করে আসছে। □

# মাওবাদ না মানবতাবাদ, আপনারা কার পক্ষে কমরেড?

**বিপ্লব বিকাশ**

অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট-এর সফল বাস্তবায়ন এবং মাওবাদীমুক্ত ভারত অভিযানের অগ্রগতির ফলে বহু কুখ্যাত মাওবাদী কমরেডের মৃত্যু ঘটেছে। বিশেষ করে বাসব রাজু ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্য এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। মনে হয় জেনারেল সেক্রেটারি স্তরের কোনো বামপন্থী উগ্রবাদী প্রথমবার এনকাউন্টারে মারা গেল। কিন্তু এই সফল অভিযানগুলোর পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে শোকসভার আয়োজন, উচ্চপদস্থ নেতাদের শোকবার্তা, টুইট এবং সিপিএমের পলিটব্যুরোর অফিসিয়াল বার্তা। প্রশ্ন উঠছে, এই 'কমরেড'দের মৃত্যুতে কাদের শোক? যারা মানবদরদি সাজেন তাদের না মানবতার শত্রুদের? আজকের বহুরূপী কমরেড বিশেষ করে যারা শহরাঞ্চলে থাকেন, রাজনৈতিক মঞ্চে সুশোভিত হন, স্টুডিয়োতে মানবদরদি বা গণতান্ত্রিক সাজেন এবং সংবিধানের সবথেকে বড়ো রক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন তারা কি পরিষ্কার ভাবে বলবেন যে কমরেড বাসব রাজু এবং অন্যান্য নিহতদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই? ভারত সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনী গরিব জনজাতি জনগোষ্ঠীকে জঙ্গলের জঙ্গিদের হাত থেকে বাঁচিয়ে মানবাধিকার রক্ষার আসল কাজ করেছে একথা তারা স্বীকার করবেন?

মানবাধিকার নিয়ে সবথেকে বেশি কথা যারা বলেন, বামপন্থী সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত সেই গরিব জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিয়ে কখনো তাঁদের বলতে শোনা যায়নি। মানবাধিকার হরণ মানে হলো কোনো ব্যক্তির বা জনগোষ্ঠীর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মৌলিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। এই অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে, জঙ্গলের অধিকার, স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিষেবার অধিকার, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার ইত্যাদি। যখন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন জোরপূর্বক বা অন্যায়ভাবে এই অধিকারগুলি কেড়ে নেয় বা বাধা দেয়, তখন তাকে মানবাধিকার হরণ বলা হয়। এটি একটি গুরুতর অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনেও এটি নিন্দনীয়। এবার আপনি ভাবুন, এই মাওবাদীরা জঙ্গলে কাদের 'মানবঢাল' হিসেবে ব্যবহার করছে এবং কাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কবজা করে রেখেছে? কোনো বড়ো শিল্পপতি নয় গরিব জনজাতিদের।

এই মাওবাদী আন্দোলনের কারণে জনজাতিদের উপর যে সহিংসতা ও দমনপীড়ন চালানো হয়েছে, তা তাদের মানবাধিকার হরণের এক নির্মম দৃষ্টান্ত। জনজাতিদের মুক্তির কথা বলে এই চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাদেরই জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে। বনে-জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে তারা জনজাতি যুবকদের জোরপূর্বক দলে টেনেছে, স্থানীয় মানুষের ওপর কর চাপিয়েছে, বনজ সম্পদের উপর কবজা করেছে এবং সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে বাধা সৃষ্টি করে স্থানীয় গরিব মানুষদের জীবনে উন্নয়নের আলো ঢুকতে দেয়নি। ফলে জনজাতিরা আরও বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত হয়ে পড়েছে। এই তথাকথিত বিপ্লব জনজাতিদের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে এবং তাঁদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে কোনো মানবাধিকার রক্ষার কথা বামপন্থীদের মুখে শোনা গেছে?

বাসব রাজু ও তার মতো বহু মাওবাদী নেতা বছরের পর বছর ধরে গ্রামীণ ভারতের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে দখল কায়েম করে রেখেছিল। জনজাতিদের 'অধিকার' রক্ষার নামে তারা আদতে সেইসব অঞ্চলের মানুষদের ঢাল বানিয়ে, যুবকদের হাতে বন্দুক ধরিয়ে চাষের জমি থেকে খনিজ সম্পদ সব কিছু লুঠ করেছে। উন্নয়ন বন্ধ করে রেখেছে, স্কুল জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। এই 'কমরেড'রা আসলে নিপীড়ক, যারা নিজেদের বিপ্লবী ভাবনায় হাজার হাজার গরিব নিরীহ মানুষকে শোষণ করেছে।

আজ যখন দেশ, সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তখন হঠাৎই মানবতার বুলি আওড়ানো শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, এরা 'আমাদের মানুষ', 'জনজাতি সন্তান', 'ভুল পথে চলে গেছে'। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই 'ভুল পথ' তাদের কে দেখিয়েছিল? যারা তাদের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেশবিরোধী মতাদর্শে প্ররোচিত করেছিল, আজ তারাই আবার 'মানবতা'র মুখোশ পরে শোকপ্রকাশ করছে কেন? এখন কেন বলছে যে মাওবাদীরা সরকারের সঙ্গে কথা বলতে চায়? এতবছর কোথায় ছিল তাদের এই মানসিকতা? এখন যখন নিরাপত্তা বাহিনী গরিব মানুষের রক্ষার্থে শেষ লড়াইয়ের বিজয়ী অভিযানে এগিয়ে চলেছে, তখন শান্তির বার্তাটা তো নিজের জন্য সময় ও সুযোগ খোঁজার অজুহাত। তার বেশি কিছু নয়। তারা শান্তিবার্তায় বিশ্বাস করেন না বলেই তো বন্দুক ধরেছে।

আজ সময় এসেছে সরাসরি প্রশ্ন করার, কমরেড, আপনি কোন পক্ষের? আপনি কি সেই পক্ষের, যারা বিপ্লবের নামে জনজাতি সমাজকে ভাইদের বুকে গুলি চালাতে বাধ্য করে? না কি আপনি সেই পক্ষের, যারা চায় শান্তিপূর্ণ ভারত, যেখানে বন্দুক নয়, বই থাকবে; রক্ত নয়, উন্নয়ন হবে? মানবতা সত্যিই যদি মূল্যবান হয়, তবে তার প্রথম দাবিদার সেইসব নিরীহ গ্রামীণ মানুষ, যাদের জীবন মাওবাদীরা বহু বছর ধরে নরকে পরিণত করেছে। তাই একটু ভেবে বলুন, মাওবাদ না মানবতাবাদ, আপনারা কার পক্ষে?


**স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)**

| | | |
|---|---|---|
| Back Cover | (Multi Colour) | Rs. 32,000.00 |
| Front Inside | (Multi Colour) | Rs. 25,000.00 |
| Back Inside | (Multi Colour) | Rs. 25,000.00 |
| Full Page | (Multi Colour) | Rs. 20,000.00 |
| Full Page | (Black & White) | Rs. 15,000.00 |
| Half Page | (Black & White) | Rs. 8,000.00 |
| Qtr. Page | (Black & White) | Rs. 4,000.00 |

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

*যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩*

# গল্পকথায় ডাক্তারজী

(২১)

## সেবা

১৯৯৩ সালে দামোদরের বন্যা এক করাল রূপ ধারণ করেছিল। এমনিতেই দামোদরকে বলা হতো বাঙ্গলার দুঃখ। সেবার যেন শুরু হয়েছিল বন্যার ভয়ংকর বিভীষিকা। পুরো বর্ধমান জেলায় গ্রামের পর গ্রাম জলের তলায়। মানুষ কোনো মতে ঘরের চালে, মাচায় শিশু-বালক-পরিবার নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়। কলকাতা থেকে নানা সংস্থার সেবা দল এল এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলির পাশে দাঁড়াবার জন্য। এরকম একটা দলের সঙ্গে দেখা গেল কেশবরাও হেডগেওয়ার মাথায় খাবারের বস্তা নিয়ে জল কাদা ভেঙে করে যাচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর দিকে। ছয় জনের এই দল রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাত্রাণ সহায়তার কাজে অংশ নিয়েছিল। কেশব রাওয়ের সঙ্গে এই সেবাকাজে ছিল— মাদ্রাজের দেশভক্ত কেএস বেঙ্কটরমণ, নলিনী, গোখলে, দেশপাণ্ডে, আরএস সুর্বে (কেএস বেঙ্কটরমণের দৈনন্দিনী থেকে পাওয়া নামের তালিকা অনুসারে)। এই ছয় জনের দল ছাড়া আরও কয়েকটা দল তাদের সঙ্গে কাজ করেছিল।

এই বিষয়ে বেঙ্কটরমণ তার দিনলিপিতে লেখেন— 'ডাক্তার (কেশবরাও) আক্ষরিক অর্থে রাত-দিন (১১, ১২, ১৩ আগস্ট) অত্যন্ত পরিশ্রম ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ছিল।' এরপরে শুরু হয়েছিল কলেরা মহামারীর প্রকোপ। রাত একটা পর্যন্ত তারা ওষুধ বিতরণের কাজ করতেন। পরের দুঃখ নিবারণে সেবাকার্যে নিজের কষ্টকে পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়ার মূর্ত উদাহরণ ছিলেন কেশবরাও হেডগেওয়ার। এরপরেও অন্যবারের বন্যাত্রাণে কেশব রাওয়ের সঙ্গী ছিলেন ডাঃ না: দা: সাভারকর, ডাঃ যাদব রাও আনে এবং ডাঃ তেণ্ডুলকর প্রমুখ। সেবার গঙ্গাসাগর মেলায় হঠাৎ কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ছুটে গেলেন কেশবরাও তার ডাক্তার বন্ধুদের নিয়ে। এক অদ্ভুত তন্ময়তা নিয়ে উদয়াস্ত সাগরমেলার ঝুপড়ি থেকে ঝুপড়িতে ওষুধ-পথ্য নিয়ে ঘুরতে থাকেন। অনেক সেবাদল থাকলেও কেশবের দলটির কর্মপদ্ধতি, অনুশাসন ও সেবা-শুশ্রূষার কর্মকৌশল ছিল ভিন্ন রকমের। বোঝা যাচ্ছিল এ শুধু সেবাকাজ ছিল না, এ ছিল সাধারণের দুঃখ দূরীকরণে নিজেকে সমর্পণের সংকল্প।

(২২)

## সন্ধিকাল

ডাঃ কেশবরাও হেডগেওয়ার 'এলএম অ্যান্ড এস' ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়ে একসময় কলকাতা থেকে নাগপুর ফিরে এলেন। পরিবারের অবস্থা, ঘর-দুয়োরের অবস্থা খুব ভালো নয়। বড়ো দাদা মহাদেব শাস্ত্রীর আগ্রহ ছিল কেশব ডাক্তারি পেশা শুরু করুক। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরেও কেশবরাও সেদিকে কোনো আগ্রহ দেখলেন না, বরং তাত্যা ফড়নবীশের বাড়িতে থেকে স্বদেশিকতার কাজেই কেশবের আগ্রহ বেশি। তাই ছোটো ভাইয়ের উপরে তিনি বেশ রুষ্ট হয়ে উঠলেন। তবুও কেশব মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করে ও কথাবার্তা বলে যেতেন। এর মধ্যে আর এক দুর্দৈব দেখা দিল। সেবারে নাগপুরে আবার প্লেগের প্রকোপ শুরু হলো। মানুষ এ বিষয়ে আগেকার অভিজ্ঞতার কারণে সতর্ক ছিল। সবাই টীকা নিতে থাকল এবং শহর ছেড়ে দূরে ঝোপড়ি বানিয়ে থাকতে লাগলো। কেশরবরাও দাদা সীতারামকে নিয়ে হাম্পইয়ার্ডের কাছে সেরকম ঝুপড়ি বানিয়ে থাকতে লাগলেন। দাদাকে বহু অনুরোধ করলেও তিনি শুনলেন না, উদ্ধত ভাব নিয়েই বললেন— 'কোন প্লেগ আমার কী করবে'? তিনি বাড়ি ছেড়ে গেলেন না, পরিণতিতে একসময় তিনি প্লেগে আক্রান্ত হলেন এবং শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। অকালে চলে গেলেন তিনি।

সুযোগ বুঝে চোর জোচ্চোররা বাড়ি থেকে বাসনপত্র জিনিসপত্র লুট করে নিল। বন্ধুরা বলল, 'কেশব, আমরা সব ব্যবস্থা করব তুমি চিকিৎসার কাজ শুরু করো। পুরো প্রদেশে মাত্র ৭৫ জন বেসরকারি ডাক্তার, সেখানে তোমার প্রয়োজন অনেক'! 'কেশবরাও শুধু দেখছি, যাক দুদিন'--- অনেক এরকম কথা বলে কালক্ষেপ করতে লাগল। বন্ধুরা একটা ঘরে ওষুধপত্র, আনুষঙ্গিক সামগ্রী জোগাড় করে ব্যবস্থাও করে দিল। দু-একজন বন্ধুর চিকিৎসা করলেও ডাক্তারি ব্যবসা বলতে যা বোঝায় তা কিছুতেই শুরু করানো যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে শুরু হলো মেয়ের বাবাদের নানা লোভনীয় প্রস্তাব। কেউ কেউ মেয়ের ঠিকুজিকোষ্ঠীও পাঠাতে লাগলেন। কেশব এখন নয় পরে, দাদার বিয়ে না হলে কেমন করে হয়, এসব বলে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১৭ সালে দাদা সীতারাম হেডগেওয়ারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো। বাড়িতে একটু পরিবর্তন এল, কমপক্ষে খাওয়া দাওয়ার দিকে। কিন্তু মেয়ের বাবারা তো নিত্য কেউ-না-কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসতে শুরু করল।

বিয়ে এড়াবার জন্য শেষে এ বিষয়ে রামপেয়ালিতে কাকা আবাজীর সঙ্গে কথা বলতে বললেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের আনাগোনা আর কেশবের ভাবগতিক দেখে কাকা আবাজী যেন একটু ক্ষুব্ধই হলেন। সোজা চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, 'বিয়ের বিষয়ে তোমার ইচ্ছেটা পরিষ্কার জানাও'। কেশবরাও বুঝতে পারলেন আর অন্তরালে থাকা যাবে না, প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াতেই হবে। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক উত্তরে তিনি কাকাকে লিখলেন— 'অবিবাহিত থেকে সারা জীবন দেশের কাজ করার আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি'। দেশের কাজ করার সময়ে যেকোনো দিন জীবন-সংকট উপস্থিত হতে পারে। সে কথা জেনেও কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট করার কি কোনো অর্থ থাকতে পারে? এই পর্ব এখানেই শেষ হলো; তখন নতুন এক পর্ব শুরুর অপেক্ষায়। □